অমলের কড়চা

প্রথম সংস্করণ, ফাল্গুন, ১৩৫৭

মুদ্রাকর :
শ্রীদুর্লভচন্দ্র কোলে
লেখাশ্রী প্রাঃ লিঃ
৭১, কৈলাস বোস ষ্ট্রিট
কলিকাতা-৬

কিশোর সঙ্ঘ, চন্দননগর
মহালয়া ১৩৫৭

মঙ্গলের রাজকন্যা

এক

॥ ভুতুড়ে গুহা ॥

১৮৬৫ সালের শীতকাল। আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের পর। লড়াই থেকে ফিরে এসে ক্যাপ্টেন জন কার্টার কপর্দকশূন্য। বন্ধু পাওয়েল খনি ইঞ্জিনীয়র। তাকেই সঙ্গে নিয়ে ও বেরুল ভাগ্যের সন্ধানে। খুঁজতে খুঁজতে আমেরিকার সুদূর পশ্চিমে আরিজোনার পাহাড়ে সত্যি-সত্যিই ওরা পেয়ে গেল একটা সোনার খনির সন্ধান। সে যুগে অমন সোনার খনির আকর খুঁজে পেয়েছে অনেকেই।

সোনার খনির মালিক হতে হলে সে সময় কিছু নিয়ম পালন করতে হত। পশ্চিমের দিকে তখন জমি পড়ে রয়েছে বিস্তর, যার যেমন খুশি দখল নিয়ে নিতে পারত। তবে সরকারকে জানাতে হত অমুক জায়গায় অতটা জায়গা আমি নিয়ে নিয়েছি, আমার মালিকানার কাগজপত্র চাই। সরকারও বিনা বাক্যব্যয়ে দিয়ে দিত জমির স্বত্ব; সেই সঙ্গে জমিতে যা কিছু আছে তারও মালিকানা। সোনা থাকলে সোনা, তেল থাকলে তেল, বনসম্পদ থাকলে তাও।

জন কার্টার আর তার অংশীদার পাওয়েল তাই আরিজোনার পাহাড় এলাকা থেকে তড়িঘড়ি ফিরে চলল প্রধান শহরের দিকে। আগেভাগে না পৌঁছুলে আর কেউ যদি ভাগ বসায়? রাতারাতি ওরা যে কোটিপতি হয়ে গেছে!

সেদিন সকালে আগেই রওনা হয়ে গেছে পাওয়েল, ঘোড়ায় চেপে। জন কার্টার পেছু নিলে নিজের ঘোড়ায় চড়ে, দুটো টাটু ঘোড়ার পিঠে মালপত্র চাপিয়ে, কিছুটা মন্থর গতিতে। পাওয়েলকে যখন দিগন্তের কিনারায় একটা ছোট বিন্দুর মত দেখাচ্ছে, এমনি সময়ে আচমকা কার্টারের নজরে পড়ল আরো কয়েকটি বিন্দু তার বন্ধুর পেছনে ধাওয়া

করে যাচ্ছে। নিশ্চয় বুনো রেড ইণ্ডিয়ান! পাওয়েল নিশ্চয় টেরও পায়নি কী অজানা বিপদ তার পেছনে!

টাটু ঘুটোকে পথেই নিজের মর্জিমতো ছেড়ে দিয়ে জন ছুটল তার ঘোড়াটিকে নিয়ে। পূর্ণগতিতে ছুটেও সারাটা দিন লেগে গেল ওদের কাছাকাছি আসতে।

এদিকে রাত নেমে এসেছে। ঝকঝকে চাঁদ উঠেছে আকাশে। জন কার্টার তবু এক নাগাড়ে ছুটেই চলেছে। হঠাৎ ওর কানে এল বন্দুকের আওয়াজ। পাওয়েল নিশ্চয় বিপাকে পড়েছে। আরেক মাইল প্রাণপণে ঘোড়া ছুটিয়ে কার্টার নিজেই গিয়ে পড়ল সেই বিপাকে। সরু গিরিখাতের ফাঁক দিয়ে একটা ফাঁকা উঁচু জায়গায় উঠে এসে জন বুঝল ব্যাপারখানা। ভয়ে থমকে দাঁড়াল সে। ওর সামনে এক ভয়ানক দৃশ্য—কয়েক শো রেড ইণ্ডিয়ান তাঁবু। ওরা নিশ্চয় অ্যাপাচে, আমেরিকার লাল ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে সবচেয়ে দুর্ধর্ষ আর দুর্দান্ত যারা। এখানেই ঘাঁটি বানিয়েছে। আর অজান্তে সেই ঘাঁটিতে গিয়ে পড়েছে পাওয়েল।

জন কার্টার বুঝতে পারছিল বেচারা পাওয়েল একাই লড়ে চলেছে দুশমনদের সঙ্গে—তখনো বন্দুকের আওয়াজ আসছে কানে। উপায় নেই, জনকে এবার যেতেই হবে বন্ধুকে বাঁচাতে।

অ্যাপাচেদের একটা জটলা দেখে ও সোজাই সেদিক পানে ঘোড়া চালিয়ে দিলে রাইফেল ছুঁড়তে ছুঁড়তে। আর সেই সঙ্গে বিকট চিৎকার। কয়েকটি রেড ইণ্ডিয়ান সেখানেই গুলি খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ল। বাকিরা হতভম্ব হয়ে গেছে। জনের চিৎকার শুনে বোধহয় ভেবেছিল কোনো উদ্ধারকারী ফৌজ এসেছে লোকটাকে বাঁচাতে।

সেই ফাঁকে ওদের জটলাটিকে ছিন্নভিন্ন করে জন কার্টার ঘোড়া দাবড়িয়ে ছুটে গেছে একেবারে ভেতরের দিকে। দেখল মাটিতে পড়ে রয়েছে পাওয়েল। শরীরে গোটা দশ বারো তীর বেঁধা।

বিদ্যুৎবেগে ঘোড়া থেকে নেমে পাওয়েলকে টেনে তুলে কোনো রকমে তার দেহটাকে কাত করে শুইয়ে দিলে ঘোড়ার জিনের ওপর।

চট্ করে ঘোড়ার লাগাম টেনে সে বাঁ দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে ঢুকে পড়ল সংকীর্ণ উপত্যকার মধ্যে। ... পৃ.৩

তারপর তেমনই দ্রুতবেগে ঝট্ করে নিজে ঘোড়ার পিঠে লাফিয়ে চড়ে রওনা দিলে সামনের দিকে।

অ্যাপাচেরা প্রথমটায় বুঝতে না পারলেও পরে হতভম্ব ভাবটা কাটিয়ে উঠল। ততক্ষণে জন অবশ্য অনেকটা দূর এগিয়ে গেছে বড় সড়কটা ধরে। এবার অ্যাপাচেরা হৈ-হৈ করে যার-যার ছোট-ছোট টাট্টু ঘোড়াগুলোতে চেপে প্রাণপণে করলে তাড়া। হাতে ওদের বল্লম, আর তীর ধনুক। জন তখনো ওদের নজরের আড়ালে। কিছুটা এগিয়ে থাকলেও বুঝতে পারল শেষ পর্যন্ত ধরা পড়তেই হবে কারণ পথ রয়েছে অনেকটা। ওর ঘোড়া আগেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। এখন আবার ডবল সোয়ারি। হঠাৎ থমকে দাঁড়াল জন।

এ রাস্তার পাশ দিয়েই বেরিয়ে গেছে একটা সরু গলির মতো গিরিখাত। চট্ করে ঘোড়ার লাগাম টেনে সে বাঁদিকে ঘুরিয়ে নিয়ে ঢুকে পড়ল সংকীর্ণ উপত্যকার মধ্যে। বুদ্ধিটা মন্দ হয়নি। খানিকক্ষণ অন্তত গা ঢাকা দিয়ে থাকা যাবে।

আর হলোও তাই। অ্যাপাচেরা চিৎকার করতে করতে সোজা রাস্তা দিয়েই ছুটে গেল। জন আধো অন্ধকার গলিটার মধ্যে নীরবে দাঁড়িয়ে কান খাড়া রেখে শুনতে লাগল ওদের আওয়াজ। বিপদটা আপাতত কেটেছে। কিন্তু পরে ওরা ভুল বুঝে ফিরে আসবেই। এখন তাই একটা নিরাপদ আশ্রয় চাই।

কিন্তু দুর্ভাগ্য! সরু পথটি হঠাৎ এক জায়গায় শেষ হয়ে মিশে গেছে পর্বত-খাতের মধ্যে। সামনে এগোবার উপায় নেই। তবে সামনে যে পাহাড়টা পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে আছে তার গায়ে রয়েছে একটা গর্তের মুখ। ওই ফোকরটার মধ্যেই তাকে আশ্রয় নিতে হবে? অ্যাপাচেরা এ পথে ঢুকলে ওটা কি আর না দেখে ছাড়বে? তেমন নিরাপদ না হলেও উপায় নেই। পাওয়েলের নিঃসাড় দেহটা নিয়ে ও করবেই বা কী! ঘোড়া থেকে নেমে পাওয়েলকে কাঁধে ফেলে পা টিপে টিপে উঠতে লাগল পাহাড়ী গর্তটার দিকে। ঘোড়া পথেই দাঁড়িয়ে থাকল। জিনসাজগুলো শুধু খুলে এনেছে জন।

গর্তটার সামনে এসে জন কার্টার দেখলে এ তো রীতিমতো গুহা! ভেতরটাও অপরিসর নয়। গুহার মেঝেতে পাওয়েলকে শুইয়ে দিয়ে জন ওর নাড়ি বুক পরীক্ষা করে বুঝতে পারল পাওয়েলের দেহে আর প্রাণ নেই। খানিকক্ষণ নিষ্পলক চেয়ে থেকে জন দুঃখে ভেঙে পড়ল ওর বুকের ওপর। পাওয়েলকে ও সত্যি সত্যি ভালবাসত। অমন সহৃদয় বন্ধু আর হয় না। বেচারী জীবনে অনেক কষ্ট করে যখন সবে ভাগ্যের মুখ দেখলে তখনই সব শেষ হয়ে গেল!

পাওয়েলের নিষ্প্রাণ দেহ ওইভাবেই রেখে ও খানিকক্ষণ গুহার ভেতরটা ঘুরে ফিরে দেখলে। গুহার পেছনের দেয়ালটা যে কোন্ আঁধারে মিলিয়ে গেছে, অনেকক্ষণ সুড়ঙ্গ ধরে হেঁটে গিয়েও তার হদিশ পেলে না জন। আবার গুহামুখের দিকে ফিরে এল।

কেমন যেন একটা গন্ধ গুহাটার মধ্যে। মনটাকে যেন নেশায় আচ্ছন্ন করে দেয়। প্রথমে ও চুপ করে বসেছিল। সেই বাষ্পগন্ধটা যেন ওর চেতনাকেও আচ্ছন্ন করছে ধীরে ধীরে। একবার গা ঝাড়া দিয়ে উঠবার ইচ্ছাটাও যেন মনে আসছে না। মনে হচ্ছে দেহ এলিয়ে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে।

ও জানে অ্যাপাচেরা এতক্ষণে ওর ধোঁকাবাজি ধরতে পেরে নিশ্চয় ফিরে আসছে এই পাহাড়ী সরু খাতটা ধরে। একটু পরে যেন সে ওদের হৈ-হৈ আওয়াজ আর টাটুঘোড়ার পায়ের শব্দও পাচ্ছে কানে। কিন্তু তবু ওর হুঁশ হচ্ছে না কেন? ভোর হয়ে সকালের প্রখর রোদ উঠেছে বাইরে। ও বুঝতে পারছে, কিন্তু কিছু করতে পারছে না। কেবল টের পাচ্ছে—মিষ্টি গন্ধটা এখন উগ্র ঝাঁঝালো হয়ে উঠছে। চারপাশে একটা ঝিমিয়ে-পড়া স্বপ্নের আবহাওয়া। কেবলি ও ঘুমিয়ে পড়তে চাইছে একটা আনন্দময় চেতনাহীনতার মধ্যে। মনে হল কী যেন একটা বস্তু পেছন দিকে নিঃশব্দে চলে বেড়াচ্ছে। তবু ঘাড় ফিরিয়ে দেখতে চাইলে না ও।

খানিকবাদে গুহার মুখের ঠিক সামনেটায় জেগে উঠল একটা বীভৎস মুখ—মাথায় পালক, সাঁদা রঙের আঁকিবুঁকি আঁকা। অ্যাপাচে! জন

কার্টার বুঝতে পারছে ওরা এসেছে।

লোকটা এগিয়ে এসে জন আর পাওয়েলের মৃতদেহটা ছাড়িয়ে আরো পেছনদিকে চেয়ে কী যেন দেখল। তারপর একটা বিকট আতঙ্কে চিৎকার করে পালিয়ে গেল। জনের মাথার কাছে শুধু খস্খস্ করে একটা ক্ষীণ আওয়াজ হচ্ছে—শুকনো পাতার উপর কেউ চলে ফিরে বেড়ালে যেমন আওয়াজ হয়।

একটু বাদে আবার গুহামুখের সামনে ফিরে এল সেই অ্যাপাচের মুখখানা। তার পাশে আরো একটা মুখ, দুটো, তিনটে, অনেক। তারপর সবাই কী যেন দেখে চোখ বিস্ফারিত করে বিরাট আওয়াজ তুলে দুমদাম্ লাফিয়ে পড়ে পালাতে লাগল। একজন তো হাত দুটো উঁচু করে সোজা ঝাঁপ দিলে সামনের গভীর গিরিখাতের মধ্যে—নিশ্চিত মৃত্যু।

জনের চেতনা সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। শুয়ে শুয়ে ও টের পাচ্ছে বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা নেমে এল। এবার চাঁদের আলো এসে পড়েছে গুহার মুখে। এমনি অর্ধচেতনভাবে শুয়ে থাকতে থাকতে দেহের মধ্যে কী যেন একটা ঘটল তার। হঠাৎ যেন প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিয়ে শরীরের মধ্যে একটা ইস্পাতের তার ঝটাং করে ছিঁড়ে গেল। তারপর খানিকক্ষণ ও কিছুই জানে না।

যখন জন কার্টারের সম্বিত ফিরে এল বলে অন্তত ওর ধারণা হল, দেখল ও গুহার দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে অদৃশ্য শত্রুর মুখোমুখি। গুহার ভেতরটা জ্যোৎস্নায় ভরে গেছে। জন কার্টারের সামনে ওরই নিজের দেহটা পড়ে রয়েছে। সে দেহের চোখ দুটো সামনের খোলা গুহামুখের দিকে স্থিরনিবদ্ধ। হাত দুটো অসাড়ভাবে দুপাশে ছড়ানো। জন একবার ওর নিষ্প্রাণ দেহটার দিকে তাকিয়ে ফের নিজের পানে চাইলে। একেবারে হতভম্ব হয়ে গেল সে। অসম্ভব!

ওই তো ও মেঝেতে পড়ে আছে আগের মতোই পোশাক পরা, অথচ এদিকে সে দাঁড়িয়ে রয়েছে উলঙ্গ!

প্রথম চিন্তাই মাথায় এল—তবে কি এই ওর মৃত্যু? ও কি মৃত্যুর

এপারেই চলে এসেছে? কিন্তু বিশ্বাস তো হয় না। বুক কেন ধুক্‌ধুক্ করছে? নিশ্বাস পড়ছে ঘনঘন, সারা শরীর ঘামে ভিজে যাচ্ছে! আবার সেই অদ্ভুত খস্‌খস্ আওয়াজটা গুহার মধ্যে। পোশাকহীন অস্ত্রহীন জন কার্টারের তবু ইচ্ছে করল না অদৃশ্য শত্রুর মুখোমুখি হতে। ওর প্রাণহীন দেহটার সঙ্গেই তো রয়েছে রিভলবার দুটো—অথচ কোনো অজ্ঞাত কারণে ইচ্ছেই জাগছে না ওগুলো স্পর্শ করতে!

জনের মনে হল পালিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোনো পথ নেই। অদৃশ্য বস্তুটা যেন চুপি চুপি এগিয়ে আসছে ওর দিকে। এই ভয়ংকর জায়গা থেকে মুক্তি পাবার শেষ চেষ্টায় তাই লাফিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল খোলা আকাশের নিচে।

আরিজোনার তারাভরা পরিষ্কার আকাশ। চাঁদের আলোয় পাহাড়, পার্বত্য পথ আর ক্যাক্‌টাস-সংকুল দিগন্তছোঁয়া সমতল জমি অপরূপ দৃশ্যের অবতারণা করেছে। জন একটু ইতস্তত করে প্রাকৃতিক শোভার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে আকাশের দিকে চাইলে। দূর দিগন্তে একটা লাল উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক যেন ওর দৃষ্টিকে টেনে নিলে। মুগ্ধ চোখে তারাটার দিকে চেয়ে আছে জন।

ওই তো ওর প্রিয় গ্রহ মঙ্গল। মঙ্গল নাকি যুদ্ধের দেবতা। জন কার্টারের সৈনিক জীবনের ওপর যুদ্ধদেবতার এক অদ্ভুত আকর্ষণ। এক আশ্চর্য শক্তি ওই গ্রহ থেকে উৎসারিত হয়ে যেন ওকে টেনে ধরছে। রুখবার উপায় নেই জন কার্টারের।

সুদূর মহাশূন্য থেকে ওকে যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে সেই গ্রহ, প্রলোভন দেখাচ্ছে, চুম্বকের আকর্ষণের মতো একটা তীব্র আকর্ষণ অনুভব করছে জন কার্টার। নির্ণিমেষ প্রতীক্ষা যেন সহ্যের বাইরে চলে গেল। হাত দুটো সামনের দিকে মঙ্গল গ্রহের উদ্দেশে প্রসারিত করল। তার পরেই ওর মনে হল ঠিক চিন্তার মতোই দ্রুততম গতিতে মহাবেগে অসীম শূন্যে পাড়ি দিয়েছে ও।—

—পলকের মধ্যে অতি তীব্র শীত। তারপরেই নিরন্ধ্র অন্ধকার।

দুই

॥ মঙ্গলগ্রহের মাটিতে ॥

এবার ক্যাপ্টেন জন কার্টারের বাকি রোমাঞ্চকর কাহিনীটা তার নিজের মুখেই শোনা যাক।

—এক অদ্ভুত অপার্থিব পরিবেশের মধ্যে এসে আমি চোখ মেলে চেয়েছি। আমি তো জানি আমি মঙ্গলগ্রহের আকাশের নিচে। কিন্তু তবু আমার মনে একবারও প্রশ্ন জাগল না তাই নিয়ে। আমি জেগে আছি, না সুস্থ মস্তিষ্কে আছি তা নিয়ে চিন্তাই করিনি। আপনারা যেমন সচেতন মনেই জানেন যে পৃথিবীতে বাস করছেন, পৃথিবীতে থাকা নিয়ে অযথা প্রশ্ন তোলেন না, আমিও তেমনি সরলভাবেই জানি যে আমি মঙ্গলগ্রহেই আছি। আমি ঘুমিয়েও নেই যে অকারণে নিজের গায়ে চিমটি কেটে দেখব!

টের পেলাম হলদেপানা শেওলার মতো নরম উদ্ভিদের বিছানায় শুয়ে আছি। চারদিকে যতদূর চোখের দৃষ্টি যায় কেবলি ওই শেওলা। বেলা দুপুর হবে। আকাশে গন্‌গনে সূর্য আমার উলঙ্গ শরীরটাকে যেন পুড়িয়ে দিচ্ছে।

বাঁ-দিকে কয়েকশো গজ দূরে একটা নিচু পাঁচিল ঘেরা জায়গা আছে মনে হল। পাঁচিলটা চারফুটের বেশি উঁচু হবে না। কোথাও জল নেই। শেওলা ছাড়া অন্য কোনো উদ্ভিদেরও চিহ্ন নেই। একটু তেষ্টা পেয়েছে, তাই ভাবলাম উঠে জলের খোঁজ করি।

উঠতে গিয়ে মঙ্গলগ্রহের প্রথম বিস্ময়ের ধাক্কা টের পেলাম। কারণ যেটুকু ঝোঁক দিয়ে পৃথিবীর মাটিতে উঠে দাঁড়াতে পারতাম, ওটুকু ঝোঁকেই আমাকে মঙ্গলের হাওয়াতে টেনে নিয়ে ফেলল প্রায় তিন গজ দূরে! অবশ্য মাটির ওপর আছড়ে পড়তে তেমন কিছু চোট লাগল না, বেশ আলগোছেই নেমে এলাম শেওলা জমির ওপর।

তারপর যা ঘটল তা একেবারে হাস্যকর। মনে হল মঙ্গলে এসে নতুন করে হাঁটা অভ্যেস করতে হবে। পৃথিবীতে শরীরের মাংসপেশীর যতটুকু জোর খাটাতে হয়, তা করলে এখানে অদ্ভুত চিড়িয়াখানার নাচ নাচতে হবে! ভদ্র সুস্থ মানুষের মতো পা ফেলে চলতে গিয়ে এমন সব বিচ্ছিরি লাফ মেরে বসছি! একেক ধাপে প্রায় তিনফুট করে এগিয়ে যাচ্ছি, এঁকে-বেঁকে পড়ে যাচ্ছি, কখনো মুখ থুবড়ে, কখনো চিৎ হয়ে। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণে অভ্যস্ত আমার পেশী মঙ্গলের এই স্বল্প-আকর্ষণ আর হাল্‌কা-বায়ুর চাপে মজার মজার খেল্‌ দেখাচ্ছে বটে!

যা হোক্‌, আমি ঠিক করেছি, ওই পাঁচিলটার ওপাশটা যে করে হোক্‌ দেখতে হবে কারণ প্রাণীবসতির একমাত্র চিহ্ন তো ওইটেই নজরে পড়ছে। তাই পায়ে চলবার চেষ্টা না করে গুঁড়ি মেরে মেরে কয়েক মিনিটের মধ্যেই পৌঁছে গেলাম নিচু পাঁচিলটার ধারে।

কোনো দরজা-জানলা দেখলাম না পাঁচিলের গায়ে। সাবধানে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে উঁকি দিলাম ভেতরের দিকে। নজর দিতেই যা দেখলাম এমন অদ্ভুত দৃশ্য আগে কখনো দেখিনি!

দেয়ালের ওপাশে পুরু নিরেট কাঁচের ছাদ। পৃথিবীর 'হট্‌হাউস্‌'-গুলোর মতো। আর তারই নিচে বেশ কয়েকশো বড়-বড় ডিম! ডিমগুলো নিটোল গোল, দুধের মতো সাদা। প্রায় সব ডিমই এক মাপের। একেকটার ঘের প্রায় আড়াই ফুটের মতো। ওরই মধ্যে পাঁচ-ছটা ডিম আবার ফুটেও গেছে। তাতে কয়েকটি কুৎসিত দর্শন প্রাণীর ছানা বসে সূর্যের আলোয় চোখ পিট্‌পিট করছে। দেখেই তো আমার আক্কেল গুড়ুম! জীবগুলোর মস্ত মাথা, সে-তুলনায় দেহ পুঁচ্‌কে। লম্বা গলা, আর ছ'টি করে পা। পরে জেনেছিলাম আসলে ওদের দুটো পা আর দুটোই হাত, মাঝের জোড়া কখনো পা, কখনো হাত হিসেবে ব্যবহার করে।

জীবটির চোখজোড়া মাথার মাঝখানে একটু উঁচুতে, এমনভাবে জেগে আছে যে সামনে-পেছনে যেমন খুশি দেখতে পায়। কানদুটো চোখের ওপরেই, ঠিক এ্যানটেনার মতো। নাকের ফুটোতে শুধু দুটি
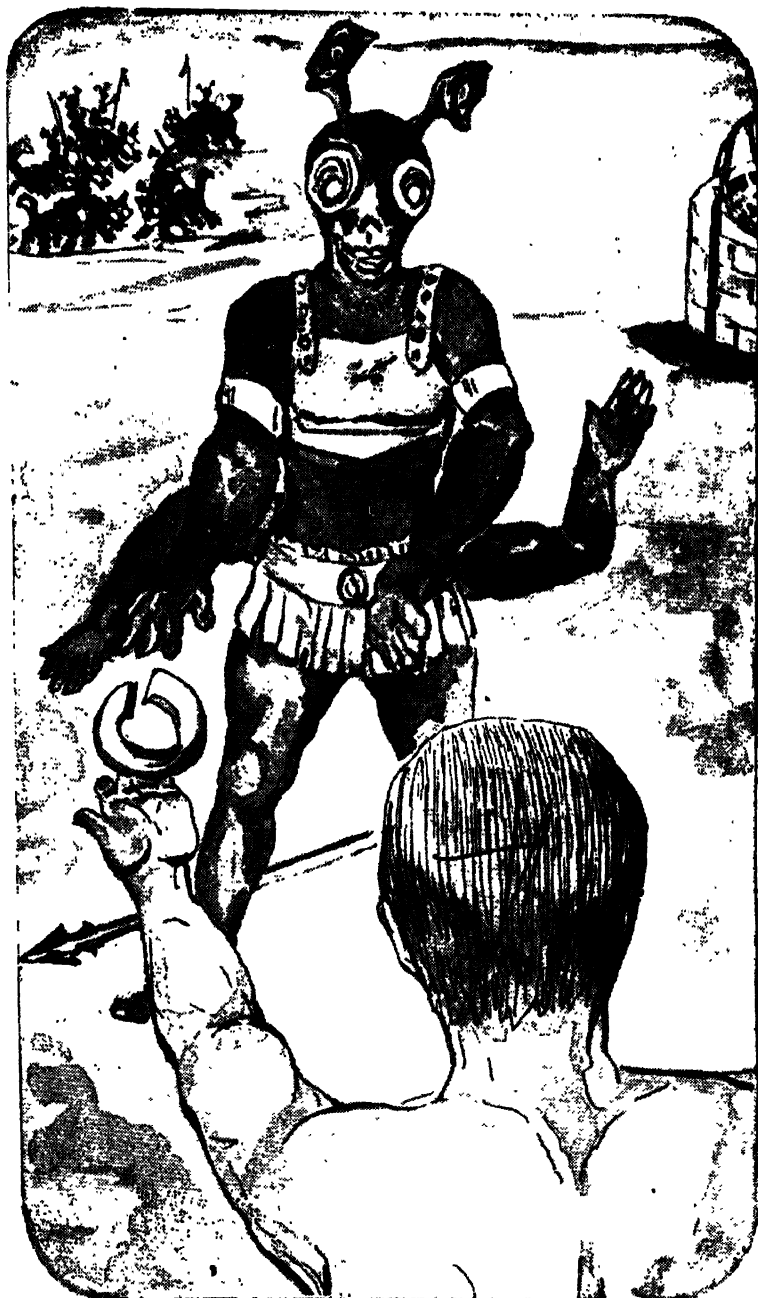
হাত বাড়িয়ে এগিয়ে গিয়ে তার হাত থেকে তুলে নিলাম সেই বাহু-কবচটা।
... পৃ.১১

চেরা গর্ত। শরীরে বিলকুল লোম নেই। রঙ হাল্‌কা হল্‌দেটে-সবুজ। চোখের তারা টকটকে লাল, তবে গোলাদুটো একেবারে সাদা। তেমনি সাদা তাদের দাঁত। দাঁতের পাটি দুটো আরো ভয়ানক। চোয়ালের নিচের দুটো বড়-বড় দাঁত তীক্ষ্ণ হয়ে বাইরে ঠেলে উঠেছে।

ডিমগুলো দেখলাম ফোটার অপেক্ষায় আছে। একেক করে খোলা ভেঙে বেরিয়ে আসছে কুদর্শন প্রাণী-শিশু। আমি এত মনোযোগ দিয়ে দেখছি যে টেরই পাইনি কখন পেছন দিকে এসে দাঁড়িয়েছে জনা কুড়ি পূর্ণ-অবয়ব মঙ্গলবাসী প্রাণী! সবাই সশস্ত্র!

নরম শেওলার ওপর দিয়ে নিঃশব্দে এসে ওরা আমাকে অনায়াসে ধরতে পারত। কিন্তু ওদের সামনের সৈনিকটির অস্ত্রশস্ত্রের আওয়াজে টের পেয়ে গেলাম ওরা এসেছে। আমার বুক লক্ষ্য করে একখানা চল্লিশ-ফুট লম্বা বল্লম বাগিয়ে ধরেছে সামনের যোদ্ধাটি। যে কুৎ'তে বাচ্ছাগুলোকে এতক্ষণ আমি নিরীক্ষণ করছিলাম তারই একটা বড় সংস্করণ এই মঙ্গলবাসী জীবটা, বা মানুষটা, যাই বলি-না কেন তাকে। লম্বায় পাক্কা পনের ফুট। ভারী দেহটা নিয়ে ঘোড়ায় চাপবার মতোই একটা আজব প্রাণীর ওপর চেপে বসে আছে। তবে জিন বা লাগাম কিছু নেই। ডানদিকের দুটো হাতে বল্লম আর বাঁ-হাত দুটো ছড়িয়ে শরীরের ভারসাম্য বজায় রাখছে।

আর সেই জানোয়ার বাহনটি কাঁধ অবধি দশফুট উঁচু। ডানে বাঁয়ে চার চারটি করে আটখানা পা। চওড়া চ্যাপটা লেজ শূন্যে উঁচোনো। বিরাট চোয়ালের হাঁ। লম্বা মোটা গর্দান। প্রভুর মতো বাহনের দেহও রোমশূন্য। চকচকে মসৃণ স্লেটের রঙ, পেট সাদা, পায়ের গোছ দুটো হল্‌দে। বিশালদেহী সৈনিকটার পেছনে আরো অমন উনিশজন জানোয়ার-সওয়ারী দানব!

ভয়ের চোটে প্রকৃতির প্রথম নিয়ম মেনে দিলাম এক প্রচণ্ড লাফ। পৃথিবীর মাপে দেওয়া সেই এক লাফেই গিয়ে পড়লাম ওদের 'ডিম্ব স্ফুটনাগারের' পেছনের পাঁচিলের কাছে। আমার অতি মানবিক লম্ফে আমি নিজেই অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। আর মঙ্গল-জীবগুলোর তো

কথাই নেই। আমায় একশো ফুট দূরে গিয়ে ছিটকে পড়তে দেখে ওরা হকচকিয়ে গেছে।

শেওলাঘাসের ওপর কোনো রকমে খাড়া হয়ে দেখি ওরা পাঁচিলের বাইরে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়েছে। ওদের মুখের ভাবে মনে হয় কেউ দারুণ বিস্মিত, কেউ যেন একটু আশ্বস্ত যে আমি ওদের বাচ্চাগুলোর গায়ে হাত দিইনি। ইশারায় আমাকে দেখিয়ে নিচু গলায় ওরা যেন কী বলাবলি করলে নিজেদের মধ্যে। হাবভাবে তেমন উগ্রতা আর নেই। ওরা দেখেছে আমার কোনো হাতিয়ার নেই, বাচ্চাগুলোর কোনো ক্ষতিও করছি না। পরে অবশ্য জেনেছিলাম ওদের সদয়ভাবের আসল কারণ আমার 'হার্ড্‌ল্‌ দৌড়ের' প্রদর্শনী, যেমনটি ওরা সারা জীবনেও দেখেনি।

মঙ্গলবাসীরা দেখতে প্রকাণ্ড হলেও, হাড়ের তুলনায় ওদের মাংসপেশী কম—মঙ্গলের মাধ্যাকর্ষণের জন্য যতটুকু পেশীশক্তি দরকার ততটুকুই আছে। পৃথিবীর মানুষের তুলনায় ওদের দৈহিক শক্তি তাই কম, চলাফেরায় চট্‌পটে ভাব নেই। আমার পার্থিব দেহের ক্ষমতা তাই মঙ্গলগ্রহে অপার বিস্ময়ের জিনিস। বোধহয় ওরা ভেবেছে এমন এক মজার প্রাণীকে ধরে দেশের লোকদের দেখাতে পারলে মন্দ হয় না। তাই আমাকে প্রাণে মারার মতলবটা ছেড়ে দিয়েছে।

না হলে শুধু ওদের দলনেতাটিকে পাঁচিলের কাছে রেখে বাকি সবাই দূরে সরে পড়বে কেন? ওই বা তার বাহন থেকে নেমে বল্লমটা মাটির ওপর রেখে দেবে কেন?

অবশ্য পালাতে গেলে আমারও বিপদ ছিল। বল্লম ছাড়া ওদের নানা অস্ত্রের মধ্যে একটি বড় মারাত্মক—সেটি রাইফেল জাতীয় কিছু। রুপোলি ধাতুর তৈরি নলচে, হালকা কঠিন কাঠের হাতলে লাগানো। দিন দুপুরে অমন কুড়িখানা অগ্নিবর্ষী অস্ত্রের সামনে পালিয়ে বাঁচা যায় না।

যাহোক ওদের নেতাটি মাটিতে বল্লম রেখে ডান বাহু থেকে মস্ত একটা ধাতুর কবচ খুলে হাতের পাতায় রেখে এগিয়ে এল আমার

দিকে। পরিষ্কার উদাত্ত কণ্ঠে কী যেন বললে আমাকে। আমি ওর ভাষা বুঝতে পারলাম না, কিন্তু এটুকু বুঝতে পারলাম যে আমার জবাবের অপেক্ষা করছে। কানের এ্যান্টেনা দুটো খাড়া করে গোল গোল চোখে উৎসুকভাবে চাইছে। আমিও চেষ্টা করলাম ইশারায় তাকে কিছু বোঝাতে। বুকের ওপর হাত রেখে ঝুঁকে নমস্কার জানালাম। বোঝালাম ওদের সদিচ্ছা আমার হৃদয় স্পর্শ করেছে। আর সেই সঙ্গে বক্‌বক্‌ করে অনেক কথাও বলে গেলাম। হাত বাড়িয়ে এগিয়ে গিয়ে তার হাত থেকে তুলে নিলাম সেই বাহু-কবচটা। নিজের কনুইয়ের ওপর ওটা বেঁধে একটু হাসলাম ওর দিকে তাকিয়ে। প্রাণীটাও দু'পাটি চোয়াল মেলে হাসল মনে হল। ওর মাঝের হাতখানা আমার হাতে মিলিয়ে দু'জনেই এগোলাম বাহনটির দিকে। সেই সময় সে ইশারা করে বাকি সেপাই-প্রাণীগুলোকে এগিয়ে আসতে হুকুম দিলে।

ওরা হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসছিল। কিন্তু সর্দার ইশারায় ওদের ধমকে দিলে। চাইছিল না বোধহয় আমি আবার ভয় পেয়ে যাই! নিজেদের মধ্যে কী যেন বলাবলি করে ও নিজের জানোয়ারের ওপর চেপে বসল। আরেকজন জন্তু-আরোহী সেপাই পেছন থেকে এগিয়ে এসে আমাকে তুলে নিল কোমর ধরে। আমি কোনোরকমে ঝুলতে ঝুলতে চললাম সেপাইটার বেল্‌ট আর ফিতে ধরে। সবাই ঘুরে রওনা দিয়েছে দূরের পাহাড় শ্রেণী লক্ষ্য করে, জোর কদমে।

তিন

॥ বন্দী হলাম ॥

মাইল দশেক চলবার পর হঠাৎ খুব উঁচুতে উঠতে শুরু করেছি আমরা। মঙ্গলগ্রহের অনেক প্রাচীন 'মৃত' সমুদ্রের মধ্যে এটাও একটা। তারই কিনারায় উঠে এসেছি। তলদেশে সেই স্ফুটনাগার, যেখানে এদের সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয়েছিল।

কয়েক মাইল যেতেই এসে পড়লাম পাহাড়গুলোর নিচে। একটা সরু গিরিখাত ডিঙিয়ে বড়সড় উপত্যকা। উপত্যকার শেষ প্রান্তে দেখা যাচ্ছে এক মস্ত প্রাসাদনগরী।

অতি পুরনো বাঁধানো সড়ক, এখন ভগ্নদশা। নজরে পড়ছে বড় বড় মহলা বাড়ি। কিন্তু প্রাণীবসতি নেই, যেন বহুদিন ধরে পরিত্যক্ত। শহরের মাঝখানে বিরাট এক চত্বর। সেখানে অবশ্য দেখলাম অলিগলি আর বাড়িগুলোতে এই একই জাতের হাজার-হাজার প্রাণী ঘোরাফেরা করছে।

গায়ের নানা অলঙ্কার ছাড়া সবাই নগ্নদেহ। মেয়েদের চেহারা পুরুষদের চেয়ে বিশেষ অন্যরকম নয়, খালি তাদের চোয়ালের দাঁতদুটো একটু বেশি উঁচোনো, বেঁকে ঘুরে কানের কাছ অবধি উঠেছে কারো কারো। বয়স্কা মেয়েরা ফুট দশ-বারো লম্বা। রঙ ওদের কিছু হাল্‌কা তবে শিশুগুলোর রঙ আরো হাল্‌কা।

অতিরিক্ত বয়স্ক বা বৃদ্ধ কাউকে দেখা যায় না। পরে শুনেছিলাম চল্লিশবছর বয়েসে ওরা নাকি সাবালক হয় আর বাঁচে প্রায় হাজার বছর। হাজারে পা দেবার আগেই তাদের অনেকে স্বেচ্ছায় এক অন্তিম অদ্ভুত তীর্থ-যাত্রায় চলে যায় 'ইস্' নামে একটা নদীর পথে। যেখানে যায় সেখান থেকে একটি প্রাণীও ফিরে আসে না নাকি! সমস্ত জীবন্ত মঙ্গলবাসী প্রাণীর একই নিয়ম।

প্রতি হাজার জনে একটি কি দু'টি জীব অসুখে ভুগে মরে। প্রায় কুড়িজন চলে যায় স্বেচ্ছানির্বাসনের তীর্থযাত্রায়। আর বাকি ন'শো

উনআশি জনই মরে দুর্ঘটনায়, মানে দ্বন্দ্বযুদ্ধ, শিকার, বিমানযাত্রা কিংবা যুদ্ধে। কিন্তু বেশির ভাগই মারা যায় শিশু-বয়েসে, একরকম বিকট সাদা গরিলার খপ্পরে পড়ে। তাই স্বাভাবিকভাবে হাজার বছর বাঁচলেও সব মিলিয়ে মঙ্গলবাসীদের গড় আয়ু বলা চলে তিনশো বছর।

শহরের চত্বরের দিকে এগিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের ওপর ওদের নজর পড়ে গিয়েছিল। শ'য়ে শ'য়ে মঙ্গলবাসী ঘিরে ধরল আমাদের। বিশেষ করে আমাকে নিয়ে টানাটানি। তবে সৈনিক নেতার প্রচণ্ড ধমকে কেউ আর সাহস করে না গায়ে হাত দিতে।

চত্বর পেরিয়ে সোজা চলে আসি এক প্রকাণ্ড প্রাসাদের প্রবেশপথে। এমন সুন্দর প্রাসাদ জীবনে একটিও দেখিনি। আগাগোড়া ঝকমকে সাদা মার্বেল পাথরে তৈরি, তারই মধ্যে অপূর্ব সোনা আর পাথরের কাজ। সূর্যের আলো যেন ঠিকরে পড়ছে তাদের গায়ে। প্রশস্ত প্রবেশপথ ঢুকে গেছে প্রকাণ্ড চাঁদোয়ার নিচে। তারই সামনে বিশাল হলঘর। সিঁড়ি নেই, সোজা পথ ক্রমে উঁচু হয়ে উঠে গেছে হলঘরের সামনে। চারদিক দিয়ে গ্যালারি ঘেরা।

অপূর্ব কাজ-করা কাঠের টেবিল চেয়ার ইতস্তত সাজানো। ভেতরে চল্লিশ-পঞ্চাশজন পুরুষ মঙ্গলবাসী একটা মঞ্চের সিঁড়ির ধাপে ধাপে বসে আছে। মঞ্চের ওপর আসনপিঁড়ি হয়ে বসে আছে এক বিপুলদেহী যোদ্ধা। সারা শরীরে তার নানা ধাতুর তৈরি অলঙ্কার। মাথায় নানা-রঙা পালক-গোঁজা চামড়ার ফিতে। তাতে কুশলী হাতে দামী পাথরের কাজ। কাঁধে উজ্জ্বল লাল রেশমের ছোট আঙরাখা, সাদা পশুলোমের আস্তর-বসানো।

অদ্ভুত লাগল ওদের বিশাল শরীরের তুলনায় বসবার আসন চেয়ার টেবিলগুলোর কোনো সঙ্গতি নেই দেখে। ওগুলো আমাদের মতোই স্বাভাবিক মানুষের মাপে তৈরি। অতিকষ্টে ওরা যেন নিজেদের আঁটিয়ে নিয়েছে ওতে। টেবিলের নিচে ওদের লম্বা পা ভাল করে ঢুকছে না। পরিষ্কার বোঝা যায় মঙ্গলগ্রহে নিশ্চয় এক সময় পৃথিবীর মানুষের আকারের জীবরাই বাস করত। চেয়ার টেবিল মায় বাড়িঘর সব কিছু

যা এরা এখন দখল করেছে তা হয়তো অধুনালুপ্ত সেই প্রাচীন মঙ্গলবাসীদেরই গড়া।

যা হোক, প্রবেশপথে ঢুকতে প্রধান দলপতির ইশারায় ওরা আমায় মাটিতে নামিয়ে দিলে। আগের মতোই সর্দারের হাতে ধরে এগোলাম সভাকক্ষে। সবাই আমাদের সর্দারের সামনে পথ ফাঁকা করে দিয়েছে।

আসনে-বসা প্রধান দলপতির সঙ্গে আমাদের সর্দারের অভিবাদন-বিনিময় হল। ওদের নিয়ম মাফিক সে সামনে এগিয়ে শাসকের নাম ধাম উপাধি সসম্মানে উচ্চারণ করলে। শাসকও তাকে যথোচিত সম্মান করলেন। জানলাম আমাদের সর্দারের নাম টার্স টারকাস্। সে আসলে একজন উপ-দলপতি, শাসকের পরেই তার স্থান। যোদ্ধা এবং রাজনীতিজ্ঞ হিসেবে সে যথেষ্ট খাতির পেয়ে থাকে। সে বোধহয় বর্ণনা দিয়েছিল কেমন করে কী অবস্থায় আমাকে ধরেছে। এবার প্রধান দলপতি স্বয়ং আমাকে উদ্দেশ করে কিছু বললে, যার এক বর্ণও বুঝলাম না। আমি সোজা চোস্ত ইংরিজি ভাষায় তাকে যা বললাম সেও তার কিছু বুঝল না বটে, তবে আমি একটু মিষ্টি হাসি দিতে, সেও মৃদু হাসলে। আমাদের দুটি প্রাণীজাতের ওই একটু মিল দেখলাম। হাসবার ক্ষমতা দু'পক্ষেরই। হয়তো সশব্দে উচ্চহাসিও দিতে জানে ওরা।

পরে জেনেছি ওদের উচ্চহাসি বড় ভয়ংকর জিনিস। এই সবুজ জাতের মঙ্গলবাসীদের কৌতুকের ধারণা একটু অন্যরকম। মৃত্যু, খুন, বন্দীহত্যার নিষ্ঠুরতায় এরা প্রচণ্ড উচ্চকিত হাসিতে ফেটে পড়ে। হত্যার নানা ফন্দিও জানে।

সমবেত সবুজ মঙ্গলবাসীরা এবার টিপে-টুপে আঙুল ঘষে পরখ করে দেখলে আমার মাংসপেশী, গায়ের চামড়া, রঙ ইত্যাদি। প্রধান দলপতি বোধহয় আমার খেলা দেখবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল। টার্স টারকাস্ তাই আমাকে টেনে নিয়ে চলল বাইরের খোলা চত্বরের দিকে।

কিন্তু আমি তো নড়ব না। একবার হাঁটতে গিয়ে আছাড় খেয়েছি! তাই ওরা বেশি জোর খাটাতে, এলোমেলো ফড়িং-এর মতো লাফিয়ে-লাফিয়ে চলতে শুরু করি চেয়ার টেবিলে ধাক্কা খেয়ে। এতে ওরা বড়

মজা পেল। আমি গুঁড়ি মেরে চলতে চেষ্টা করলাম কিন্তু ওদের পছন্দ হল না ব্যাপারটা। একজন যোদ্ধা এসে রূঢ়ভাবে হি-হি করে হেসে আমাকে সজোরে দু'পায়ের ওপর টেনে খাড়া করতে গেল। এ অবস্থায় একজন মানুষের মতো মানুষ যা করে আমি তাই করে বসলাম। জানোয়ারসুলভ অভদ্রতার শোধ নিতে ঝেড়ে দিলাম ওর চোয়ালের ওপর প্রচণ্ড ঘুষি। বেটা ছিটকে পড়ল আহত ষাঁড়ের মতো, মেঝের এক কোণে। আমিও ওদের পালটা আক্রমণের আশঙ্কায় সামনের টেবিলটার পেছনে আশ্রয় নিয়েছি, তবে ভয়ের কিছু ঘটল না। সবাই সঙ্গীটার দুরবস্থা দেখে হো-হো করে হেসে হাততালি দিতে লাগল! প্রাণীটাকে সাহায্য করতে কেউ এগিয়ে এল না—আশ্চর্য! টারকাস্ হাত বাড়িয়ে আমাকে ধরে হাঁটিয়ে নিয়ে চলল চত্বরের দিকে—নির্বিকার ভাবে।

কেন ওরা আমাকে বাইরে নিয়ে এল, তা আগে বুঝিনি। সবাই এক সঙ্গে চেঁচিয়ে বললে—'স্যাক্'। কয়েকবার বললে কথাটা। শেষে টার্স টারকাস্ দু'চারটে লাফ মেরে দেখিয়ে-দেখিয়ে বললে—স্যাক্। বুঝলাম 'স্যাক্' মানে লাফ দিতে হবে। আমিও এবার সাহস করে বেশ লম্বা লাফ দিলাম—এক ধাপে দেড়শো ফুট! সাবধান ছিলাম বলে সামলে নিয়েছি, মুখ থুবড়ে পড়িনি।

ওরা যখন আবার বললে 'স্যাক্', আমি থোড়াই পরোয়া করলাম। চটে-মটে হাতের ইঙ্গিতে নিজের পেট আর মুখ দেখিয়ে জানালাম আমার খিদে পেয়েছে, খেতে চাই। টারকাস্ এবার দলপতিকে কিছু বললে। দলপতি একটি মেয়েকে ডেকে নিলে ভিড়ের মধ্যে থেকে। তাকে কী যেন আদেশ জানিয়ে আমায় ইশারা করলে মেয়েটির সঙ্গে যেতে। মেয়েটির একটি বাড়ানো হাত ধরে বেরিয়ে গেলাম চত্বরের ওপারে একটা বড় বাড়ির ভেতর।

আমার সঙ্গী মেয়েটি আট ফুট লম্বা। সবে বড়দের দলে এসেছে। তবে এখনো পুরো লম্বা হয়নি। গায়ের রঙ হাল্কা জলপাই-সবুজ। চকচকে মসৃণ গায়ের চামড়া। ওর নাম শুনেছি সোলা। টার্স

টারকাস্‌দের পরিচারক দলের মেয়ে। একটা বড়সড়ো কামরার মধ্যে আমায় নিয়ে এল সে। কামরার মেঝেতে রেশম আর পশুলোমের ছড়াছড়ি দেখে বুঝলাম এটাই ওদের শোবার ঘর হবে।

সোলা আমায় কামরার মাঝখানে রেশমের গাদার ওপর বসিয়ে দিলে। তারপর ঘুরে একটা অদ্ভুত শিস দিলে। সঙ্গে সঙ্গে পাশের ঘর থেকে একটা আজব প্রাণী ছুটে এল। ছোট ছোট দশখানা পা গুটিয়ে উবু হয়ে বসল মেয়েটির সামনে—বাধ্য কুকুরছানার মতো। আকারে পৃথিবীর শেট্‌ল্যাণ্ড টাট্টুঘোড়ার সমান, তবে মুখখানা ঠিক ব্যাঙের মতো। চোয়ালে তিন পাটি লম্বা ধারালো দাঁত।

... বীভৎস সাদা জানোয়ার ... আমাকে ধরাশায়ী করে বুকের উপর চাপিয়ে দিলে তার প্রকাণ্ড ভারি একখানা পা। .. পৃ.১৯

চার

॥ পাহারাদার কুকুর ॥

সোলা জানোয়ারটার দুষ্টু চোখজোড়ার দিকে তাকিয়ে আমাকে দেখিয়ে-দেখিয়ে বিড়বিড় করে কী যেন হুকুম করলে। তারপর ঘর ছেড়ে বেরিয়ে চলে গেল। এই ভয়ানক চেহারার প্রাণীটা আমায় একদলা মাংসের মতো গিলে খেতে পারে ভেবে শঙ্কিত হয়ে উঠেছি। কিন্তু দেখলাম তা কিছু করল না, শুধু ভাল করে একটু দেখে সোজা হেঁটে গেল ঘরের দরজার দিকে। তারপর সেখানেই লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল।

মঙ্গলগ্রহের পাহারাদার কুকুরের সঙ্গে এই আমার প্রথম পরিচয়। যতদিন সবুজ প্রাণীগুলোর হাতে বন্দী ছিলাম ও আমার যথেষ্ট দেখাশোনা করেছে, দু' দুবার আমার জীবনও রক্ষা করেছে। নিজের ইচ্ছায় একমুহূর্তও আমার সঙ্গ ছাড়েনি। সোলা ওকে 'উলা' বলে ডাকে।

সোলা বাইরে গেছে, তাই ঘুরে-ঘুরে সমস্ত কামরাটা দেখলাম। দেয়ালের গায়ে বিচিত্র সব ছবি। অদ্ভুত সুন্দর নিসর্গ দৃশ্য—পাহাড় সমুদ্র গাছ ফুল-ফল, রোদ ঝলমল বাগিচা বনপথ। এ ছবি তো শুধু মানুষদের পক্ষেই আঁকা সম্ভব! পাকা হাতে আঁকা, অথচ একটিও প্রাণীর ছবি নেই যা থেকে বুঝতে পারি মঙ্গলের লুপ্ত অতীতের অধিবাসীদের চেহারা কেমন ছিল।

নানা কল্পনা করছি। এমন সময় সোলা এল খাবার আর পানীয় নিয়ে। মেঝের ওপর আমার সামনে খাবার রেখে একটু দূরে বসে মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগল আমাকে। খাবারের মধ্যে পনীর জাতীয় কিছু এবং কোনো জানোয়ারের দুধ। তবে স্বাদ খুব খারাপ লাগল না। ওটা নাকি আসলে জন্তুর দুধই নয়। একরকম গাছ থেকে প্রচুর পরিমাণে এ-দুধ পাওয়া যায়। এ গাছ বিনা জলেই গজিয়ে ওঠে। একেকটা গাছ থেকে দশ বিশ কিলো দুধ আসে।

খেয়ে শরীর চাঙা হল একটু। বিশ্রামের প্রয়োজন ছিল। তাই শুয়ে

পড়লাম পশমের চাদরগুলো পেতে। সঙ্গে সঙ্গে ঘুমে চোখ বুজে এল। বেশ ক'ঘণ্টা ঘুমিয়েছি নিশ্চয়। মাঝরাতে ঘুম ভেঙে বড় শীত করতে লাগল। গায়ের ওপর বোধহয় নরম লোমের লেপ টেনে দিয়েছিল কেউ—ঘুমের ঘোরে গা থেকে সরে গেছে। হঠাৎ একটা হাত এসে গায়ের ওপর লেপটাকে টেনে দিলে।

বুঝলাম সোলা। এতক্ষণ আমার ওপর ঠিক নজর রেখেছিল। যতো সবুজ প্রাণীকে এই মঙ্গলগ্রহে দেখেছি, সোলাকেই একমাত্র দেখেছি যার দয়ামায়া বোধ কিছু আছে।

মঙ্গলের রাতগুলো ভয়ানক ঠাণ্ডা। উষা বা গোধূলি বলে কিছু নেই—হঠাৎ রাত হয়ে যায়, হঠাৎই দিন আসে। আর রাত নামার সঙ্গে-সঙ্গে উত্তাপ কমে যায় ভীষণরকম। বড় অস্বস্তিকর মনে হয় ঠাণ্ডা-গরমের আকস্মিক বদল। আকাশে ছ'টো চাঁদ—যদি একসঙ্গে ওঠে তো উজ্জ্বল জ্যোৎস্নায় ভরে যায়, আবার ছটোই যদি একসঙ্গে গরহাজির থাকে তো ঘুটঘুটে অন্ধকার!

মঙ্গলের ছটো চাঁদই গ্রহ থেকে খুব কাছে। একেবারে কাছেরটা সাড়ে সাত ঘণ্টায় আকাশ ঘুরে যায়। তাই কখনো রাতে ছ'তিনবারও তাকে আকাশে উঠতে দেখা যায়—তারই মধ্যে তার সব রকমের তিথি পরিক্রমা, প্রতিপদ থেকে পূর্ণিমা। ছ'বোনের মতো ছটি চাঁদই যখন আকাশে ওঠে, মাঝে মাঝে অপূর্ব স্থন্দর লাগে দেখতে। প্রকৃতি এত আলোর ব্যবস্থা করেছে বলে সবুজ জাতের মঙ্গলবাসীরা কৃত্রিম আলো জ্বালাবার ব্যাপারে অতি কৃপণ। তাই পুরনো মশাল, মোমবাতি আর অদ্ভুত এক রকম গ্যাসের বাতি জ্বালায়। বিনা পলতের এই গ্যাস বাতি খুব তীব্র সাদা আলো দেয় বটে, তবে গ্যাসটা খনি থেকে জোগাড় করতে হয় বলে সহজে এরা ব্যবহার করতে চায় না। এদের স্বভাব এমনিতে অলস, কোনো পরিশ্রম করতে গররাজি। বহুযুগ ধরে সবুজ জীবগুলো তাই অর্ধ-বর্বর অবস্থাতেই রয়ে গেছে মঙ্গলগ্রহে।

ভোর অবধি একটানা ঘুমিয়ে যখন জেগে উঠেছি, দেখি কামরায় আরো পাঁচজন মেয়ে আর সোলা ঘুমোচ্ছে। শুধু ওই জানোয়ার

'কুকুরটাই' বিনিদ্র চোখে এক নাগাড়ে নজর রেখেছে আমার ওপর। চুপি চুপি উঠে বেরুবার মতলব করলাম। যা হবার হবে। দরজার দিকে এগিয়ে যেতে জানোয়ারটা নিঃশব্দে পথ ছেড়ে পেছু হটে গেল।

আমি যখন জনশূন্য রাস্তায় নেমে চলতে শুরু করেছি, দেখি, নাঃ 'কুকুর' জানোয়ারটা যে বিলক্ষণ পেছু নিয়েছে আমার! হাত দশেক পেছনে। কী আপদ! তার মানে বিশেষ করে আমার ওপর খবরদারির জন্যই পাহারার ব্যবস্থা। শহরের একেবারে প্রান্তে এসে পৌঁছুতেই সে নিজ মূর্তি ধারণ করলে। এক লাফে সামনে এসে দাঁতমুখ খিঁচিয়ে আমার পথ আটকালে। আর এগোনো চলবে না।

আমি দুষ্টুমি করে ওর মাথার ওপর দিয়েই একটি বড় লাফ মেরে অনেকটা দূর অবধি এগিয়ে গেলাম। কিন্তু তবু সে জব্দ হবার বান্দা নয়। এমন তীব্রবেগে কোনো জানোয়ার ছুটতে পারে অতোগুলো ছোট-ছোট পায়ের ওপর, তা ধারণাই করতে পারিনি। যখন আমায় প্রায় ধরে ফেলেছে, ইচ্ছে করেই ওকে ডিঙিয়ে মারলাম এক উলটো লাফ। এবার সে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে। তবু ঘুরে ধেয়ে আসতে লাগল আমার দিকে। আমি অবশ্য ওর আগেই শহরে পৌঁছে গেছি।

এবার ওকে বোকা বানাবার জন্য আমি চত্বরের পাশের একটি খোলা জানলার ওপর তড়াক্ করে লাফ দিয়ে চড়ে বসলাম। জানলার চৌকাঠের ওপর বসে তিরিশ ফুট উঁচু থেকে দেখলাম উলা একেবারে বেকুব বনে গেছে। রাস্তায় দাঁড়িয়ে লাফ দেবার বৃথাই চেষ্টা করছে।

আচম্বিতে জানলার ভেতর থেকে একটা প্রকাণ্ড কঠিন হাত এসে আমাকে সজোরে টেনে নিলে ঘরের ভেতরে।

একটা বীভৎস সাদা জানোয়ার, যাকে আমি দেখতেই পাইনি, আমাকে ধরাশায়ী করে বুকের ওপর চাপিয়ে দিলে তার প্রকাণ্ড ভারি একখানা পা। জীবটার চেহারা অনেকটা আফ্রিকার গরিলার মতো, তবে উচ্চতায় পনের ফুট। এরও ছ'খানা পা। মাঝের পা দুটো অবশ্য

বেশ বলিষ্ঠ। গায়ে তেমন লোম নেই কিন্তু মাথার ওপর এক গোছা খাড়া সাদা চুল।

দাঁত মুখ খিঁচিয়ে জানোয়ারটা কাঁ কাঁ করে কীসব শব্দ করতে আরেকটা জীব কোথা থেকে ছুটে এল হাতে একটা বিশাল মুগুর নিয়ে। এ জানোয়ারটিরই সাথী হবে। মুগুর দিয়ে আমার মাথা ফাটাবার মতলব তার। সবে মুগুরটা শূন্যে তুলেছে এমন সময় মূর্তিমান যমদূতের মত একটা বহুপদী জানোয়ার যেন বিদ্যুতের মতো ছুটে এল ভেতর দিকের দরজা দিয়ে। উলা! সোজা এসে কামড়ে ধরল সাদা গরিলা-সাথীটার টুঁটি। যে গরিলাটা আমাকে চেপে ধরেছিল সে ভয়ে আর্তনাদ করে জানলার ওপর লাফিয়ে পড়ে বাইরে পালিয়ে গেছে ততক্ষণে।

চট্ করে দেয়ালে পিঠ লাগিয়ে দেখতে লাগলাম দুই শক্তিশালী জানোয়ারের মৃত্যু-লড়াই। এমন বেপরোয়া নাছোড়বান্দা অন্ধ হিংস্রতা কোনো পৃথিবীর মানুষ আগে দেখেনি! উলা প্রথম আক্রমণের সুযোগ নিয়ে গরিলাকে প্রায় মাটিতে শুইয়ে ফেলেছে, এমন সময় আমার সম্বিত এল। মুগুরখানা তুলে নিয়ে সজোরে মাথা ফাটিয়ে দিলাম গরিলাটার। কিন্তু তার দু'হাতের সাঁড়াশির চাপে ততোক্ষণে উলার নাভিশ্বাস উঠেছে।

ইতিমধ্যে প্রথম গরিলাটা ফিরে এল ভেতরের দরজা দিয়ে। মৃত সাথীকে দেখে বিকট মুখভঙ্গি করে এগিয়ে আসতে লাগল। মুখ থেকে অজস্র ফেনা তুলে দাঁত কিড়মিড় করছে। আমি প্রথমে মতলব করে-ছিলাম জানলা টপ্‌কে বাইরের নিরাপদ রাস্তায় গিয়ে পড়ব। কিন্তু আমার রক্ষক উলা বড় করুণ নেত্রে আমার দিকে চেয়ে আর্তনাদ করছে। আমি মনস্থির করে সোজা গরিলাটার মুখোমুখি হলাম। হাতাহাতি লড়তে পারব না ভেবে ঝাঁ করে মুগুরটা ছুঁড়ে দিলাম তার হাঁটুর নিচেটা লক্ষ্য করে। সে ঘা খেয়ে পা হুমড়ে আমারই ঘাড়ের ওপর পড়ে আর কি! পুরনো কৌশলে মারলাম তার চোয়ালের ওপর প্রচণ্ড ঘুষি। কাত হয়ে পড়ে যাবার আগেই বাঁ হাতের মুঠো পাকিয়ে আর একটা

ঘুষি ঝাড়লাম পেটে। অবশেষে ধরাশায়ী হল দানবটা।

হঠাৎ পেছন থেকে কে যেন খুক্‌খুক্ করে হেসে উঠল। দেখি টার্স টারকাস্ কয়েকজন সঙ্গীকে নিয়ে উপভোগ করছে দৃশ্যটা। সোলাও রয়েছে দলে। ওরা হাসতে থাকলেও সোলাকে মনে হল গম্ভীর আর উদ্বিগ্ন। আমাকে দেখেশুনে আশ্বস্ত হল যে আমার বিশেষ কিছু চোট লাগেনি কোথাও।

আহত উলাকে দেখে বাকিরা কিন্তু খুশি হয়নি। নিজেদের মধ্যে কী বলাবলি করে একজন সেপাই তার পিস্তলটা কোমর থেকে খুলে তাক করল আমার রক্ষকের দিকে। মুহূর্তের মধ্যে আমিও একটা লাথি মারলাম তার হাত লক্ষ্য করে। পিস্তলের গুলি ফস্‌কে ছিট্‌কে বসে গেল জানলার চৌকাঠের ওপর। লোকটা খেপে গিয়ে কিছু করার আগেই টারকাস্ মাঝে পড়ে কী যেন হুকুম করলে। সবাই তখন চুপচাপ সার বেঁধে বেরিয়ে গেল বাইরে। আমি উলা আর সোলার সঙ্গে খানিকক্ষণ এ ঘরেই রয়ে গেলাম।

মঙ্গলগ্রহে এসে নিষ্ঠুর নির্বোধ সবুজ জাতের মানুষগুলোর মধ্যে দুটোই বন্ধু পেয়েছিলাম। একটি সোলা, আমার সর্বক্ষণের স্নেহশীলা পরিচারিকা, দ্বিতীয়টি এই কুৎসিত মূক পাহারাদার জীবটা। এর পশু-দেহের মধ্যে যে ভক্তি ভালবাসা আর কৃতজ্ঞতা দেখেছি তার শতভাগের একভাগও মঙ্গলের পঞ্চাশ লক্ষ সবুজ প্রাণীর মধ্যে ছিল কি না সন্দেহ।

পাঁচ

॥ ডিম থেকে বাচ্চা 'মানুষ' করা ॥

আস্তানায় ফিরে এসে সকালের খাবার খেলাম—কাল রাতের সেই একই পদ। সোলা আমাকে রাজপথের চত্বরে নিয়ে গেল। দেখি স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সবাই সেখানে জড়ো হয়ে মহা উৎসাহে সেকেলে হাতির মতো বিশালদেহ কতকগুলো জানোয়ারকে সাজাচ্ছে। সবাই মিলে হাত লাগিয়ে তিনচাকার একরকম রথের সঙ্গে জানোয়ারগুলোকে জুতছে। তা প্রায় আড়াই শো রথ হবে—সবগুলোই বেশ জমকালো করে সাজানো। প্রত্যেকটাতে একেকজন নারী সওয়ারী নানা পাথর আর ধাতুর গহনা পরে, সিল্ক আর পশুলোমে আসন ঢেকে রথ সাজিয়ে বসেছে।

রথটানা 'ঐরাবতগুলোর' পিঠে একেকজন জোয়ান সবুজ-চালক। কোনো জন্তুরই হাওদা নেই, লাগাম বলগা নেই। ওদের চালানো হচ্ছে সম্পূর্ণ 'অতিমানসিক' টেলিপ্যাথি শক্তি দিয়ে।

মঙ্গলের সমস্ত জাতের অধিবাসী এই আশ্চর্য শক্তির অধিকারী। যার ফলে ওদের ভাষা অত্যন্ত সরল ও সংক্ষিপ্ত।

রথের সারি যাত্রা শুরু করতেই সোলা আমাকে টেনে নিয়ে একটা খালি রথে বসালো। ক্রমে আমরা এসে পড়লাম শহরের সেই প্রবেশ পথে যা আমার আগে থেকে চেনা। সারির সামনে একেক লাইনে পাঁচজন করে দু'শো যোদ্ধা, পেছনেও তাই। পঁচিশ তিরিশজন 'ঘোড়া'-জন্তুর সওয়ারী অভিযাত্রীদের পাশে-পাশে চলেছে। আমি ছাড়া স্ত্রী পুরুষ বালক সবাই রীতিমতো অস্ত্রসজ্জিত। আর রথের পেছন পেছন একটি করে শিকারী 'কুকুর'। আমাদের উলাও যথারীতি রয়েছে সঙ্গে।

আজকের এই অভিযানের লক্ষ্য 'ডিম্ব-স্ফুটনাগার'। মৃত সমুদ্রের সমতলভূমিতে পাঁচিল-ঘেরা সেই জায়গা যেটা আমি প্রথম দেখেছিলাম মঙ্গলগ্রহের মাটিতে নেমে। যথাস্থানে এসে পড়তেই সমস্ত প্রাণী যেন পাগলের মতো ছড়িয়ে পড়ল চতুর্দিকে।

দেয়ালঘেরা স্ফুটনাগারের কাছে সব রথ সারি বেঁধে দাঁড়াল সামরিক কায়দায়। প্রধান দলপতি বিশালদেহী লোরকাস টোমেল প্রথমে নামল বাহন থেকে। পেছনে তার আরো বিশজন যোদ্ধা। সামনে এগিয়ে যেতে টারকাসের সঙ্গে তার কী সব কথাবার্তা হল। আমাকে স্ফুটনাগারের কাছেপিঠে যেতে ওরা আপত্তি করেনি। আমিও পাঁচিলের ওপাশে কাঁচের ঘরের ভেতরে উঁকি ঝুঁকি মারলাম। দেখলাম এই ক'দিনে প্রায় সব কটা ডিমই ফুটে গেছে। কুৎসিত ছানাগুলো কলরব তুলেছে 'তা' দেবার যন্ত্রটার মধ্যে। বাচ্চাগুলো তিন-চারফুট লম্বা। কেবল ছটফট করছে খাওয়ার জন্য।

নেতাদের নিজেদের মধ্যে শলাপরামর্শের পর ওদের প্রথম কাজ হল স্ফুটনাগারের দেয়াল ভাঙা—একটা পথ বের করতে হবে। ওই পথেই বোধহয় মঙ্গলগ্রহের সবুজ শিশুগুলো বেরিয়ে আসবে। বয়স্কা স্ত্রীলোক আর তরুণ মেয়ে-পুরুষ দু'সার বেঁধে দাঁড়িয়েছে। ওদের মাঝখান দিয়ে চলবার পথ ফাঁকা রেখেছে, এদিকে রথের সারি থেকে ওপাশের খোলা মাঠ পর্যন্ত।

দেয়াল ভেঙে রাস্তা বেরুতেই ছোট বাচ্চাগুলো সেই ফাঁকা পথ ধরে হরিণের মতো ছুটে আসতে লাগল। যেগুলো শেষ অবধি ছুটে আসতে পারল তাদের একেক করে ধরে কোলে তুলে নিল মেয়েরা। তারপর সার ভেঙে যে-যার রথের দিকে ছুটে গেল বাচ্চাগুলোকে নিয়ে।

সোলাকে খুঁজতে গিয়ে দেখি সেও একটি কুৎসিত ছোট বাচ্চাকে বুকে আঁকড়ে ধরে বসে আছে রথে।

মঙ্গলগ্রহে সবুজ জাতের শিশুগুলোকে মানুষ করার মানে স্রেফ তাদের কথা বলতে আর অস্ত্র ধরতে শেখানো। এক বছর বয়েস থেকেই হাতিয়ার ধরতে হবে। ডিমে 'তা' দেবার পাঁচটি বছরে ওরা এমনিতেই পুষ্ট হয়ে যায়—ডিম থেকে বেরিয়ে শুধু লম্বা-চওড়া হওয়া নিয়ে কথা। ওরা হল সমাজের সাধারণ সম্পত্তি, ওদের মা'রাও ওদের চেনে না, বাপও না। ওদের শিক্ষার ভার সেইসব মেয়েদের ওপর যারা ডিম

ফুটে বেরিয়ে আসার পর ওদের পাকড়াও করে নিতে পেরেছে। অনেক পালিকা মা আছে যারা হয়তো কখনো ডিমই পাঠায়নি ফুটনাগারে। যেমন আমাদের সোলা। এতে ওদের কিছু এসে যায় না, কারণ মঙ্গলের সবুজ জাতের প্রাণীদের মধ্যে মাতা-পিতৃস্নেহ বলে কিছু জানা নেই। জন্ম থেকে বাচ্চারাও বাবা-মার ভালবাসা কিছু বোঝে না। শক্ত সমর্থ থাকলেই ওরা বেঁচে থাকবার অধিকারী। বিকৃতদেহ বা অক্ষম হলে তাদের বাঁচিয়ে রাখা হয় না।

শক্ত সমর্থ প্রাণী-শিশুদের বাছাই করার অদ্ভুত পদ্ধতি তাদের। মৃত্যুর ফলে জনসংখ্যা কমলে ওরা তা পূরণ করে ইচ্ছেমতো। বছরে যতো ডিম ওরা পাড়ে তার ভেতর থেকে আকার ওজন ইত্যাদি পরীক্ষা করে বাছাই হয় শ'খানেক ডিম। সেগুলো ওরা প্রথমে রাখে মাটির নিচে গোপন ঠাণ্ডা-কুঠরিতে। 'তা' দেবার উপযোগী নয় সেখানকার উত্তাপ। কুড়িজন বিশেষজ্ঞ দলপতি আগে সেগুলো পরখ করে দেখবে। পাঁচ বছরে পাঁচশো বাছাবাছা নিখুঁত ডিম পছন্দ করে ঠাণ্ডা কুঠরিতে রেখে তারপর সেগুলোকে পাঠাবে ফুটনাগারে—'তা' দেবার জন্য। প্রায় বায়ুহীন তাপন-যন্ত্রে সাজানো থাকবে আরো পাঁচ বছর, শুধু সূর্যের তাপে 'তা' দেওয়া হবে ডিম ফোটার আগে। ফুটনাগারগুলো লোকালয় থেকে দূরে বানানো হয় যাতে সহজে অন্য শত্রু-প্রাণীজাতের খপ্পরে না পড়ে। এরকম বিপদ হলে সর্বনাশ—পরের পাঁচ বছর সমাজে আর কোনো শিশুই থাকবে না।

শহরে ফিরে আসার পরদিন দেখলাম ভোর থাকতে উঠে সেপাইরা কোথায় যেন চলে গেল, ফিরল সেই সন্ধ্যায়। শুনলাম নাকি মাটির নিচের ঠাণ্ডা ডিম-ঘর থেকে ডিম নিয়ে ওরা পৌঁছে দিয়ে এসেছে ফুটনাগারে, তারপর সেখানে পাঁচবছরের জন্য দেয়াল গেঁথে দিয়ে তবে সবাই ফিরেছে। ওরা নিজেদের ঘরবাড়ির কাছে কেন ডিম-ঘর আর ফুটনাগার রাখে না এ রহস্যের কোনো জবাব পাইনি কোনোদিন।

এবার সোলার কাজ হল দুগুণো। বাচ্চাটিকে দেখতে হবে আর সেই সঙ্গে আমাকেও। তবে খুব কঠিন হল না কাজটা। মঙ্গলের

পড়াশোনায় আমরা দুজনেই সমান শ্রেণীর ছাত্র। তাই আমাদের দুজনকেই সোলা একসঙ্গে তালিম দিতে লাগল। ওর বাচ্চাটা খোকা, চারফুট লম্বা, কিন্তু খুব সবল ছেলে। ওকে নিয়ে আমি খুব মজা পেতাম। মঙ্গলের ভাষা অতি সরল, একহপ্তার মধ্যে আমি মোটামুটি সব কাজের শব্দই শিখে ফেলেছি। ওরা আমাকে যা বলে তার বেশির ভাগ কথাই বেশ বুঝতে পারি। সেই সঙ্গে সোলার শিক্ষায় অতি-মানসিক শক্তিও চর্চা করে বেশ আয়ত্ত করে ফেললাম—যার ফলে আশেপাশে যা-কিছু-ঘটে, ওরা যা-কিছু ভাবে সবই তীক্ষ্ণ অনুভবে বুঝে ফেলতে পারি।

সোলা সবচেয়ে অবাক হয়ে যায় আমি কেমন করে ওদের মনের সব কথাই সহজে ধরে ফেলি অথচ ওরা কেউ আমার মনের কথার সামান্য আঁচও পায় না। শুরুর দিকে আমার ভালো লাগেনি ব্যাপারটা, কিন্তু পরে দেখলাম এতে আমার খুশি হবারই কথা—মঙ্গলের জীবগুলোর ওপর আমি বেশ এক হাত নিতে পারি, দরকার পড়লেই।

ছয়

॥ আকাশপথের বন্দিনী ॥

ডিম থেকে ছানা সংগ্রহের অনুষ্ঠান শেষ হবার তিনদিন বাদে আমরা এখানকার সাময়িক আস্তানা গুটিয়ে রওনা হব সবুজ জীবদের আপন দেশের দিকে—যেখানে তাদের স্থায়ী বসতি। শহরের বাইরের খোলা ময়দানে সবে এদের শোভাযাত্রার সামনের ভাগটা গিয়ে পৌঁচেছে এমন সময় হঠাৎ হুকুম হল এক্ষুনি সবাইকে পশ্চাদপসরণ করতে হবে।

এ বিষয়ে সবুজ প্রাণীদের যেন অনেকদিনের অভিজ্ঞতা—মুহূর্তের মধ্যে কুয়াশার মতো কোথায় সব লোকজন লুকিয়ে পড়ল। তিন মিনিটের মধ্যে পথে একটি রথ বা অতিকায় ঘোড়া বা সৈন্যসামন্ত কেউ রইল না। সোলা আর আমি একটা বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়েছি। হঠাৎ এমন ভাবে ফিরে আসার কী ব্যাপার ঘটল বুঝবার জন্য সটান ছাদের ওপরে গিয়ে উঠি।

ছাদের ওপর থেকে পাহাড় আর ওপাশের উপত্যকার দিকে তাকিয়ে আন্দাজ করতে পারলাম কারণটা। ধূসর রঙের একটা বড় উড়োজাহাজ পাহাড়ের মাথার ওপর দিয়ে নিচু হয়ে উড়ে আসছে। পেছন-পেছন একেক করে আরো অনেক কটা। ধীরে ধীরে রাজসিক চালে প্রায় মাটি ছুঁয়ে দুলে-দুলে উড়ে আসছে। প্রত্যেকটার গায়ে আগা-মাথা জুড়ে লম্বা কাপড়ের মস্ত ফালিতে কিছু লেখা। উড়োজাহাজগুলো পৃথিবীর এরোপ্লেনের মতো নয়, বরং তাদের আকার ডেক-স্টীমারের মতো—সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে সত্যিই 'উড়ো-জাহাজ' একেকখানা।

স্পষ্ট দেখলাম ওপরের ডেকে আর ছাদের দিকে অনেক প্রাণীমূর্তির আনাগোনা। ওরা আমাদের দেখতে পেয়েছে, না এমনিই পরিত্যক্ত শহরটার দিকে তাকিয়ে আছে তা বোঝা গেল না। কিন্তু সাংঘাতিক অভ্যর্থনা জুটল ওদের কপালে। আশপাশের বাড়ির জানলাগুলো

থেকে সবুজ জীবেরা আচমকা বিনা-প্ররোচনায় প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ করতে লাগল ওদের ওপর।

ভোজবাজির মতো মুহূর্তে দৃশ্যটা যেন পালটে গেল। শোধ নেবার জন্য একেবারে সামনের উড়োজাহাজটা পাশ ঘুরিয়ে শূন্যে দাঁড়াল, ছুঁড়তে শুরু করল ওদের কামান এ-পক্ষের গোলাগুলির জবাবে। একে একে সব কটি জাহাজ ওইভাবে এসে শূন্যে দাঁড়িয়ে কামান চালাচ্ছে, আবার সোজা হয়ে ফিরে যাচ্ছে আপন সারিতে। কিন্তু এ-পক্ষের যেমন প্রচুর অস্ত্র গোলাবারুদ, তেমনি অব্যর্থ টিপ। স্পষ্ট দেখলাম উড়ো-জাহাজের একেকটা প্রাণী একেক গুলির আঘাতে শুয়ে পড়ছে। জাহাজের ওপরের যন্ত্রপাতি, কাপড়ের ফালিতে আগুন ধরে গেল। ওদের গুলিগোলা কোনো কাজেই লাগল না, আচম্‌কা হামলায় ওদের নাবিকরা থই পাচ্ছে না একদম। পনের কুড়ি মিনিটের মধ্যে সরে পড়তে লাগল যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকেই। কয়েকটা উড়োজাহাজ বেশ জখম হয়েছে, গুলিগোলা থামিয়ে ওরা এখন পালাতেই ব্যস্ত।

এবারে ছাদের ওপর থেকে এরা প্রকাশ্যে গুলিগোলা ছাড়বার পরও পাল্‌টা জবাব দিতে পারলে না ওরা। একটি ছাড়া বাকি সব জাহাজই ধীরে ধীরে দূর পাহাড়ের দিকে অদৃশ্য হয়ে গেল। এ জাহাজটি সবচেয়ে বেশি জখম হয়েছে—মনে হচ্ছে ডেকের ওপর নাবিকও কেউ বেঁচে নেই। ক্রমে কাটা-ঘুড়ির মতো পাক খেয়ে এসে পড়ল আমাদের দিকেই। এপক্ষের যোদ্ধারা গুলিবর্ষণ বন্ধ করেছে, বোঝাই যাচ্ছে জাহাজটা এখন নিতান্ত অসহায়।

টালমাটাল অবস্থায় উড়ে এসে জাহাজটা শহরের খোলা মাঠের পাশে একটা বাড়ির ওপর প্রায় ধ্বসে পড়তে যাচ্ছে, এরই মধ্যে খানিকটা আন্দাজ করে এপক্ষের সেপাইরা ঘোড়া-জন্তু ছুটিয়ে গেছে ঘটনাস্থলে। ওরা হাজার হাজার লম্বা বর্শা দিয়ে ঠেকিয়ে ধরল জাহাজটাকে। তারপর বাড়ির জানলা থেকে আঁকশি-লাগানো কাছি ছুঁড়ে জাহাজটাকে আটকে রাখল শূন্যেই। শক্ত করে বেঁধে রেখে ওরা

দুপাশ দিয়ে উঠল জাহাজের ওপর। তন্ন তন্ন করে পুরো জাহাজ তল্লাসী করেও একটি জীবিত প্রাণীকে দেখতে পেল না। এমন সময় একটা কলরব উঠতেই দেখি ওরা নিচের ডেকের ভিতরের কামরা থেকে একটা জ্যান্ত ছোটখাটো মূর্তিকে টেনে আনছে বাইরে।

সবুজ মঙ্গল-যোদ্ধাগুলোর পাশে প্রাণীটিকে দূর থেকে দেখাচ্ছে ছোটখাটো, ওদের অর্ধেকও হবে কিনা সন্দেহ। আমার জানলার বারান্দা থেকে যতখানি দেখলাম, প্রাণীটা দু'পায়ের ওপর সোজা হয়েই চলছে। বন্দীকে মাটিতে নামিয়ে এনে ওরা জাহাজটা লুটপাট করতে শুরু করলে। এক এক করে রথে চাপিয়ে নিয়ে যেতে লাগল জাহাজের পশরা। হাতিয়ার, গুলিগোলার রসদ, সিল্ক, পশুলোম, দামি রত্ন, প্রচুর জমানো খাবার, পানীয় আর সেই সঙ্গে পিপেবোঝাই জল। মঙ্গলগ্রহে এসে জল আমি এই প্রথম দেখলাম।

লুটপাট শেষ করে উড়োজাহাজটাতে আগুন ধরিয়ে ওরা ছেড়ে দিলে মঙ্গলের আকাশে। অনেকক্ষণ ধরে দক্ষিণ-পূর্ব দিগন্তের দিকে তাকিয়ে দেখলাম এক উড়ন্ত মহা-চিতার মতো নাবিকহীন চালকহীন আকাশরথটি শূন্যে মিলিয়ে যাচ্ছে।

একটু বিষণ্ন মনে নিচের রাস্তায় নেমে আসি। পেছনে রয়েছে উলা। দেখি সোলা ছুটে আসছে হন্তদন্ত হয়ে আমাকে খুঁজতে। বললে আজ আর স্বদেশে ফেরার অভিযান হবে না। দলপতি টোমেল শেয়ানা যোদ্ধা, রথের সারি আর বাচ্চাদের নিয়ে খোলা সমতল জায়গায় আবার কোনো বিপদে পড়তে চায় না।

নগর-চত্বরে আসতেই যা দৃশ্য আমার চোখে পড়ল তাতে আমার মন যেমন ভীত আর ব্যথিত হল তেমনি আশা আর আনন্দেও ভরে উঠল। মঙ্গল-জীবগুলোর ভিড়ের মধ্যে এক ঝলক নজর পড়ল— উড়োজাহাজের সেই বন্দী প্রাণীকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছে দুই সবুজ দানবী, পাশেরই একটা বাড়ির মধ্যে। একটি তন্বী তরুণীর মূর্তি, হুবহু পৃথিবীর মেয়েদের মতো চেহারার আদল। প্রথমটা সে আমাকে দেখতে পায়নি, কিন্তু বাড়িটার প্রকাণ্ড দরজার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যাবার

আগে মুখ ফিরিয়ে তাকাতেই আমার চোখের ওপর ওর চোখ পড়ে গেল। ও বাড়িতেই বুঝি সে বন্দিনী হয়ে থাকবে।

সুন্দর গোলপানা মুখখানার ওপর উজ্জ্বল আয়ত চোখ দুটি, মাথায় একরাশ কালো কোঁকড়া চুল। গায়ের রঙ হালকা লালচে তামাটে।

আমার দিকে নজর পড়তে বিস্ময়ে তার চোখ বড় বড় হয়ে গেল। হাত দিয়ে সামান্য ইশারা করে কী যেন আমায় বোঝাতে গেল যা আমি বুঝতে পারলাম না। আমার দিকে তাকিয়ে এক মুহূর্ত ওর যে আশা আর নতুন সাহসের ব্যঞ্জনা জেগেছিল তা যেন ক্রমে নিভে গেল—তার বদলে জাগল ক্ষোভ আর চাপা বিদ্রূপের চিহ্ন। তারপর ওকে ওরা টেনে নিয়ে গেল পরিত্যক্ত বাড়িটার অন্তরালে।

সাত

॥ ওদের ভাষা শেখা ॥

নিজেকে সামলে নিয়ে সোলার দিকে তাকাতেই বুঝলাম ও আমাদের ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছে। ওর স্বাভাবিক ভাবলেশহীন মুখের ওপর যেন কেমন একটা অন্যরকম ছাপ দেখে অবাক হলাম।

আরেক বিস্ময় হল আস্তানায় ফিরতেই একজন যোদ্ধা-সেপাই এসে আমার হাতে তুলে দিল কিছু অস্ত্র আর সামরিক সাজসজ্জা। দুর্বোধ্য ভাষায় কিছু বিড়বিড়িয়ে বললে, চেহারায় যুগপৎ সম্ভ্রম অথচ শাসানোর ভঙ্গি। সোলা ওর কয়েকটি সঙ্গিনীকে নিয়ে আমার সাজসজ্জা, কোমরবন্ধ, বুকের চামড়ার বর্ম, ইত্যাদি কাটছাঁট করে আমার মাপমতো তৈরি করে দিলে। তারপর আমি রীতিমতো যোদ্ধার বেশে ঘুরে ফিরে বেড়াতে লাগলাম।

সেদিন থেকে সোলা আমাকে ওদের নানা অস্ত্রের রহস্য, প্রয়োগ-কৌশল বুঝিয়ে রীতিমতো যুদ্ধবিদ্যায় তালিম দিতে শুরু করেছে। চত্বরের আঙিনায় গিয়ে নিয়মিত হাতিয়ার চালানো অভ্যেস করি। এদের মেয়েরা শুধু যে যুদ্ধবিদ্যায়ই তালিম দেয় তা নয়। সামরিক রসদ মায় গোলাবারুদ সব ওরাই তৈরি করে। আসল লড়াইয়ের সময় ওদের থাকে নিজস্ব রক্ষিত ফৌজ। প্রয়োজনে পুরুষদের চেয়েও সাংঘাতিক লড়াই করে।

ক'দিন আর সেই বন্দিনীটিকে দেখিনি কোথাও। তারপর একদিন সেই প্রাসাদের সভাকক্ষ যেখানে প্রধান দলপতি টোমেলের সঙ্গে আমার প্রথম মোলাকাত, সেইখানে চকিতের জন্য তার চেহারাটা নজরে পড়ল। ওকে অনাবশ্যক জোর খাটিয়ে পশুর মতো টেনে আনছে রক্ষিণীরা। সোলা আমাকে যেমন মায়ের মতো স্নেহ-যত্ন করত, এ দেখি তার একেবারে উলটো ব্যবহার! এর আগেও লক্ষ্য করেছি, এবারও দেখলাম রক্ষী স্ত্রীলোকগুলোর সঙ্গে বন্দিনী ওদেরই ভাষায় কথা কইছে, যার মানে ওদের দু'জাতের একই ভাষা। আমি সোলাকে

তাগাদা দিতে লাগলাম ওদের ভাষাটা আমাকে তাড়াতাড়ি শেখাতে। এক হপ্তার মধ্যে তাই বেশ সড়গড় করে ফেললাম—এখন সহজেই ওদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে পারি।

ইদানিং আমাদের শোবার হল-কামরাটিতে আরো কিছু স্ত্রীলোক আর সন্ত-প্রসূত বাচ্চার আবির্ভাব হয়েছে। এরা রাতে শোবার আগে রোজই কিছু গল্পগাছা করে। সেদিন বন্দিনীকে সভাগৃহে আনার পর ওরা ওই নিয়ে কথা বলছিল রাতে। আমি কান পেতে রইলাম।

ওরা প্রশ্ন করছিল সারকোজা নামে একটি বয়স্কা স্ত্রীলোককে। সে নাকি সেই সভায় হাজির থেকে সবকিছু শুনেছে। একজন বললে—লাল মেয়েটিকে ওরা কবে শাস্তি দেবে জানো? ওর মরণ দেখবার জন্য প্রাণ ছটফট করছে। নাকি টোমেল তাকে আটকে রাখবে কিছু শর্ত আদায়ের লোভে?

—আমাদের সঙ্গে তাকেও নিয়ে যাবে থার্ক শহরে, এই ওরা ঠিক করেছে। সর্বাধিনায়ক তাল-হাজুসের সামনে খেলার উৎসব হবে, সেখানেই মারা হবে তাকে।

সোলা বললে—কিন্তু অমন সুন্দর ফুটফুটে মেয়েটাকে ওরা খুন করবে? তার চেয়ে বরং তাকে আটকে রাখুক।

সোলার এই সামান্য দুর্বলতাটুকুর জন্য ওরা সবাই ভয়ানক চটে গেল।

—কী বলছিস রে সোলা! তোর জন্ম হওয়া উচিত ছিল দশ লাখ বছর আগে যখন আমাদের এ গ্রহে শুধু সমুদ্রের জল আর মাটি। ওই মাটির মতোই নরম ছিল সেকেলে জীবগুলোর মন। জানিস্, এতদিনে আমরা কতো এগিয়ে এসেছি? ওসব বাজে ন্যাকাকান্নার যুগ আর নেই। টার্স টারকাসের কানে গেলে তোর কিন্তু ভাল হবে না বলে দিচ্ছি।

কথাগুলো সারকোজা বুড়ির। সোলা কিন্তু একটুও না দমে বেশ কড়া করেই জবাব দিলে—লাল মেয়েটির জন্য একটু দুঃখ প্রকাশ করে কিছু অপরাধ তো করিনি। আমাদের কোনো ক্ষতি সে করেনি।

ওর হাতে আমরা পড়লেও আমাদের কোনো ক্ষতি করত না নিশ্চয়। লড়াই তো ওদের মরদগুলো করে, তাও যে করে সে তো আমাদেরই হামলাবাজির শোধ নিতে। ওদের নিজেদের জাতের মধ্যে কোনো ঝগড়া-লড়াই নেই। যুদ্ধ করে নেহাৎ প্রয়োজনে। আর আমরা সব সময় হানাহানি করছি—লাল জাতের সঙ্গে তো বটেই, কারুর সঙ্গেই আমাদের শান্তি বলে কিছু নেই। তা ছাড়া নিজের মধ্যেই জনে-জনে মারামারি করে মরছি আমরা।...সেই ডিম ফুটে বেরিয়ে আসার পর যতদিন না ইস্ নদীর তীর্থে গিয়ে পরমশান্তি পাচ্ছি ততদিন কেবলই অশান্তি, কেবলই খুনখারাবি। এর চেয়ে ছেলেবয়েসে মরে যাওয়া ঢের ভাল।...টার্স টারকাসকে তোমাদের যা খুশি নালিশ জানাতে পার, কিন্তু এ জীবনকালেই যা দুঃখ পাচ্ছি তার চেয়ে বেশি কষ্ট আর কী দেবে?

সোলার মুখে এমনি সব ভয়ানক কথা শুনে বাকি মেয়েরা বিস্ময়ে থ' বনে গেছে। আর কথাটি না কয়ে সবাই চুপ করে যে যার মতো শুয়ে পড়ল। এ ব্যাপারটা থেকে আমি এইটুকু বুঝলাম যে বেচারি বন্দী মেয়েটির ওপর সোলার সহানুভূতি আছে আর আমি যদি সোলার হাতে না পড়ে অন্য স্ত্রীলোকের পাহারায় থাকতাম তাহলে আমাকে আর বাঁচতে হত না। বুঝলাম পালাবার একটা রাস্তা করতে হলে সোলার সাহায্য নিতে হবে, এবং তা পাবোও। এবিষয়ে সোজাসুজিই কথা বলব একদিন।

দেজা থোরিস্ কনুইয়ের ওপর ভর দিয়ে উঁচু হয়ে চোখ বড় বড় করে দেখছিল আমার কাণ্ডকারখানা। ... পৃ.৩৭

আট

॥ বীর শুধু নয়, অধিনায়ক ॥

পরদিন খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে পড়ি। এখন আমার নিজের খুশিমতো ঘোরাফেরার অধিকার। তবু সোলা বলেছে শহরের বাইরে যাবার চেষ্টা যেন না করি, এ ছাড়া সর্বত্র আমার অবাধ গতি। সোলা অবশ্য সাবধান করে দিয়েছে যেন নিরস্ত্র হয়ে না ঘুরি কারণ পুরনো মঙ্গল সভ্যতার যুগের সব পরিত্যক্ত শহরের মতো এ-শহরেও সাদা গরিলাদের উপদ্রব আছে।

শহরের সীমানার বাইরে যেতে আগের মতোই মানা, উলা আমাকে সে চেষ্টা করতেও দেবে না। নিষিদ্ধ এলাকার দিকে গেলে সে যেন-তেন-প্রকারেণ জীবিত কি মৃত অবস্থায় আমাকে টেনে নিয়ে আসবেই। সুতরাং, সোলার মতে, আমি যেন উলাকে অযথা না ওস্কাই।

আজ সকালে একটা নতুন রাস্তা ধরে শহরের শেষ সীমায় এসে পড়েছি। সামনে জমি নিচু হয়ে অসংখ্য সরু খাদে মিশেছে, সেখানে ছোট ছোট টিলা। বড় লোভ হল ঘুরে আসতে। ভাবলাম দেখাই যাক্ না আমাদের উলার দায়িত্বজ্ঞান কতটা? ওকে পরীক্ষা করার এই এক সুযোগ। এমনিতেই কতকটা বুঝি দু'বার ওর প্রাণ বাঁচাবার পর কৃতজ্ঞতায় আমার বেশ অনুরক্ত হয়ে পড়েছে। হয়তো আমার পুরোই বশ হয়ে যাবে। ওর নিষ্ঠুর বর্বর প্রভুগুলোকে আর মানবে না।

সীমাচিহ্নের কাছে আসতেই উলা ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার সামনে। পায়ের ওপর গা ঘেঁষে চেপে রইল। কিন্তু হিংস্রতা নেই চোখে, একটা করুণ অনুনয়ের ভঙ্গী শুধু। আগে ওকে কোনো দিন আদর করিনি, পিঠ চাপড়াইনি। আজ আমি মাটিতে বসে দু'হাতে ওর প্রকাণ্ড গলাখানা জড়িয়ে ধরলাম। নতুন শেখা মঙ্গলের ভাষায় ওকে কিছু বলতেই ওর ভাবখানা হল দেখবার মতন। একবার দশহাত-পা মেলে চিৎ হয়ে পায়ের কাছে গড়াগড়ি খেয়ে তার বিরাট-দেহটা চাপিয়ে দিল আমার ঘাড়ের ওপর। কী ওজন রে বাবা! তবু ওর হুঁশ নেই,

ছোট কুকুরের মতো খেলতে লাগল আমাকে নিয়ে। বেদম হাসি পেল আমার।

হো-হো করে হেসে উঠতে উলা একদম ঘাবড়ে গেল। আমার কোলে মাথা গুঁজে কুঁই-কুঁই করতে লাগল। বুঝলাম আমার এ-হাসিটার সে অন্য মানে করেছে, মঙ্গলের অভ্যাস মতো। উচ্চ হাসি মানে অত্যাচার, খুন। নিজেকে সামলে নিয়ে ওকে আদর করে দুটো কথা বলে হুকুম করলাম আমার পেছন-পেছন চলতে। এর পর সন্দেহ রইল না—উলা আমার একেবারেই বশ হয়ে গেছে।

পাহাড়ের দিকে খানিকক্ষণ হেঁটে ঘুরে এলাম। তেমন আকর্ষণীয় কিছু নেই সেখানে। অগণিত উজ্জ্বল রঙের ফুল, অদ্ভুত তাদের আকার। গিরিখাতটা ক্রমে উত্তরের দিকে গিয়ে মিশে গেছে আরো সব দূরান্ত পাহাড়ের গায়ে। যা হোক, তাড়াতাড়ি ফিরে এলাম উলাকে নিয়ে। উলা যে আমার দলে বিলকুল ভিড়ে গেছে টার্স টারকাসদের কাছে সে খবর গোপন থাকাই ভাল।

শহরের চত্বরে ফিরে আসতে তৃতীয়বার দেখতে পেলাম সেই বন্দিনী মেয়েটিকে। প্রাসাদবাড়ির প্রবেশপথের সামনে রক্ষিণীরা তাকে ঘেরাও করে দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে দেখতে পেয়ে সে তীব্র ভ্রূকুটি করে মাথা একেবারে ঘুরিয়ে নিলে অপরদিকে। ওর এই ভঙ্গিটা এতই মেয়েলি, ঠিক পৃথিবীর মেয়েদের মতো; আমার আত্মাভিমানে আঘাত লাগল। তবু দীর্ঘদিন বাদে যেন একটা চেনা-জানা আত্মীয়তার অনুভূতি আমার হৃদয়কে স্পর্শ করেছে। আমিও দাঁড়িয়ে পড়লাম ভিড়ের মধ্যে, কী ঘটে তা দেখতেই হবে।

বেশি সবুর করতে হল না। টোমেল তার দলনায়কদের নিয়ে প্রাসাদের সামনে এসে পৌঁচেছে। সভাকক্ষে ঢোকার আগে ইশারা করলে বন্দিনীকে নিয়ে ওদের পেছন-পেছন যেতে। এদের মধ্যে এখন আমার মোটামুটি কিছু খাতির হয়েছে জানি—তাছাড়া ওদের ভাষায় যে আমার দখল এসেছে তা ওরা কেউ জানে না। তাই ঝুঁকি নিয়ে আমিও ঢুকে পড়লাম সভাকক্ষের ভেতরে।

মঞ্চের সিঁড়ির ধাপগুলোতে সভাসদেরা বসেছে। সামনের আঙিনায় রক্ষিণী-বেষ্টিতা বন্দিনী দাঁড়িয়ে। ওর দুটো রক্ষিণীর একজন হল সেই সারকোজা বুড়ি। বন্দিনীর ওপর অযথা জোর খাটাচ্ছে, অতি অকারণেই বেচারী মেয়েটির শরীর নখ দিয়ে খিমচে ধরে কব্জি ঘোরাচ্ছে, আগু-পিছু করাবার জন্য ধাক্কা মারছে। সারকোজা যেন তার ন'শো বছর বয়েসের পুরো আক্রোশ আর ঘৃণা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে এই অক্ষম নিরস্ত্র বন্দিনীর ওপর।

লোরকাস্ টোমেল সভার মধ্যে আমাকে দেখতে পেয়ে একটু অধৈর্য আর বিরক্ত হয়ে টারকাস্‌কে কিছু জিজ্ঞেস করলে। টারকাস্ জবাবে কী বললে বুঝলাম না, তবে টোমেল হেসে মুখ ফিরিয়ে নিলে। তারপর আর কেউ নজর দিলে না আমার ওপর। সভার কাজ শুরু হল।

বন্দিনীকে জিজ্ঞেস করলে টোমেল—নাম কী তোমার?

—আমি হেলিয়াম রাজ্যের মর্স্ কাজাকের মেয়ে দেজা থোরিস্।

—তোমাদের অভিযানের কী উদ্দেশ্য ছিল?

—বৈজ্ঞানিক গবেষণা। আমার ঠাকুরদা হেলিয়ামের রাষ্ট্রপ্রধান। আমাদের দলটিকে পাঠিয়েছিলেন গ্রহের বায়ুপ্রবাহের মানচিত্র নতুন করে বানাতে আর বাতাবরণের ঘনত্ব পরীক্ষা করতে।

নিচু মিষ্টি গলায় মেয়েটি ফের বললে—যুদ্ধের জন্য আমরা তৈরি ছিলাম না, কারণ আমাদের উদ্দেশ্য শান্তিপূর্ণ। জাহাজের গায়ে কাপড়ে আর নিশানে সবকিছুই লেখা ছিল। যে কাজে আমরা বেরিয়েছিলাম, তা আমাদের আপনাদের উভয়েরই স্বার্থে। আপনি তো জানেন আমাদের চেষ্টা আর পরিশ্রম না থাকলে বাতাস আর জলের অভাবে মঙ্গলের একটি প্রাণীও বাঁচতো না। বহু যুগ ধরে আমরাই তো এ-গ্রহের হাওয়া-জল পরিমাণ মতো মাপে রেখেছি। আপনাদের সবুজ মানুষদের পশুর মতো বিরোধিতা সত্ত্বেও এটা আমরা করে আসছি বরাবর। আপনারা কি কোনোদিনও আমাদের সঙ্গে বন্ধুভাবে বাঁচতে শিখবেন না? অন্যদেশ ছাড়াও নিজেদের মধ্যেই কি আপনাদের কম

ঘৃণা দ্বেষ? আপনারা আমাদের পূর্বপুরুষদের শান্তিময় জীবনে ফিরে আসুন। দেখবেন আমরা লাল মানুষেরা আপনাদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়াব। আমরা আপনারা মিলে একযোগে এ গ্রহের মুমূর্ষু জীবনকে বাঁচিয়ে তুলব।...আমি লাল রাজ্য-প্রধানদের সবচেয়ে শক্তিশালী নেতার পৌত্রী হিসাবে এই প্রস্তাব করছি। আসবেন আপনারা?

লোরকাস্ টোমেল আর তার অন্য রণনায়করা মন দিয়ে শুনছিল তরুণী মেয়েটির বক্তৃতা। ওদের মনে কী ভাবোদয় হয়েছে তা কেউ জানে না, তবে আমার মনে হচ্ছিল কথাগুলো ওদের মন স্পর্শ করেছে। এখন কেউ যদি সাহস করে একটু মুখ খোলে তো এদের ইতিহাসই পালটে যাবে।

এবার টার্স টারকাস্ বলতে উঠেছে দেখলাম। মুখে তার এমন একটা ভাবের প্রকাশ যা আগে কখনো দেখিনি কোনো সবুজ যোদ্ধার মুখে। বেশ একটা দ্বন্দ্ব চলছে তার মনে—পুরনো চিন্তা, চিরাচরিত নীতির বিরুদ্ধে। রূঢ় হিংস্র চেহারার মধ্যে কেমন যেন কোমল সদয় ভাব ফুটেছে।

কিন্তু টার্স টারকাস্ যা বলতে উঠেছিল তা আর তার বলা হল না। একটি ছোকরা যোদ্ধা নিশ্চয় আন্দাজ করেছিল বয়স্ক নেতাদের মনের কথা। সে তৎক্ষণাৎ এক লাফে সিঁড়ি থেকে নেমে বন্দিনীর গালে প্রচণ্ড এক ঘুষি মারলে। দুর্বল মেয়েটির দেহের উপর একখানা পা রেখে সমবেত সভাসদদের দিকে তাকিয়ে প্রবল অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল—কুৎসিত নিরানন্দ হাসি।

এক মুহূর্ত ভেবেছিলাম টার্স টারকাস্ বোধহয় তাকে একেবারে খুনই করে ফেলবে। টোমেলের মুখের ভাবও পশুটার এই কাজে সায় না-দেবার মতো। কিন্তু তাদের সে মনের ভাব বেশিক্ষণ রইল না। নিজেদের সম্মান বাঁচাতে তারাও অগত্যা একটু ক্ষীণ হাসি দিলে। মঙ্গলের সবুজ দানবদের এ-অদ্ভুত কৌতুকে তাদের অন্তত সশব্দ হাসিতে ফেটে পড়া উচিত ছিল!

পশুটার হাসির আওয়াজ মেলাতে না মেলাতে আমি ঝাঁপিয়ে পড়েছি তার ওপর। ছোকরা প্রায় বারো ফুট লম্বা, কিন্তু তখন আমার প্রচণ্ড ক্রোধ উপচে পড়ছে—ওদের কাউকেই আমি গ্রাহ্য করি না। শূন্যে লাফিয়ে উঠে তার মুখের ওপর মেরেছি এক ঘুষি। সে তার ছোরাটা বের করতে আমিও হাতে নিলাম নিজের ছোরা। আরেকবার ওর বুকের ওপর চড়ে ওর পিস্তলের বাঁটখানা এক পায়ে আঁকড়ে ধরে ডান হাতখানা দিয়ে চেপে ধরলাম ওর প্রকাণ্ড একখানা দাঁত, আর বাঁ-হাতে ওর বুকের ওপর একের পর এক ছোরার আঘাত চালিয়ে গেলাম।

আমি ওর শরীরের সঙ্গে লেপটে আছি বলে ছোরাখানা ব্যবহার করতে পারছিল না, পিস্তলও বের করতে পারছিল না। আমাকে ঝেড়ে ফেলে দেবার চেষ্টা ছাড়া আর কিছুই তার করার ক্ষমতা নেই তখন। শরীরটা তার প্রকাণ্ড হলে কী হয়, জোর তো আমার কম নয়। তারপর আর কয়েকটি মুহূর্ত পরেই তার রক্তাক্ত প্রাণহীন দেহ সশব্দে ধরাশায়ী হল।

দেজা থোরিস কনুইয়ের ওপর ভর দিয়ে উঁচু হয়ে চোখ বড় বড় করে দেখছিল আমার কাণ্ডকারখানা। আমি ওকে হাত ধরে মেঝের ওপর দাঁড় করালাম। তারপর কামরার এক পাশে একটা বেঞ্চির দিকে টেনে নিয়ে এলাম।

এবারও মঙ্গল-প্রাণীদের কেউ আমায় বাধা দেয়নি। আমি সিল্কের আঙরাখা ছিঁড়ে তার টুকরো দিয়ে মেয়েটির নাকের রক্ত মুছে দিচ্ছি। ও একটু সুস্থ হয়ে আমার হাতের ওপর হাত রেখে চোখে চোখ রেখে বলল—তুমি এ-কাজ করলে কেন? আমায় তো বন্ধু হিসেবে দেখবার কোনো লক্ষণই দেখাওনি, গ্রাহ্যই করোনি! এখন নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে দলের সঙ্গীকে মেরে ফেললে? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।

আমি চুপ করে রয়েছি দেখে ফের বললে সে—তুমি কেমন ধারা মানুষ যে এই সবুজ প্রাণীগুলোর সঙ্গে থাকো? দেখতে তো তুমি

আমাদেরই মতো, শুধু গায়ের রঙটা সাদা গরিলাগুলোর থেকে একটু যা গাঢ়। সত্যি বল তো তুমি মানুষ, না মানুষের চেয়ে কিছু বেশি ?

বললাম—সে সব লম্বা কাহিনী। এখন বলার সময় নেই। শুধু মনে রেখ আমি তোমার বন্ধু।

—তা হলে তুমিও কি বন্দী ? তবে থার্কিদের মোড়লের মতো পোশাক-আশাক কেন ? নাম কী তোমার ? দেশ কোথায় ?

—হ্যাঁ দেজা থোরিস, বন্দী আমিও। নাম জন কার্টার। পৃথিবীর দেশ আমেরিকার ভার্জিনিয়া রাজ্যে আমার বাস, সেখানেই ঘর। এ সব অস্ত্র পোশাক আমায় কেন দিয়েছে এরা তা আমিও জানি না। আর এখুনি জানলাম যে আমার এ-পোশাক এদের নায়কদের পোশাক।

আমাদের কথাবার্তায় বাধা পড়ল—একটি সবুজ সৈনিক এসেছে হাতে অস্ত্র-বর্ম-পোশাক নিয়ে, ঠিক সেবারের মতো। সেই মুহূর্তে দেজার প্রশ্নের জবাব পেয়ে গেলাম, আমার কাছেও হেঁয়ালিটা পরিষ্কার হয়েছে।

দেখলাম আমার নিহত প্রতিদ্বন্দ্বীর দেহের সমস্ত সাজ পোশাক খুলে নেয়া হয়েছে। ওগুলো এখন আমার পুরস্কার। গতবার আমার অস্ত্রশস্ত্র এনেছিল যে মঙ্গলযোদ্ধাটি, এ সৈনিকটার মুখের ভাবও তার মতোই—সম্ভ্রম আর শাসানি! ওদের আজব নিয়মটা এবার বুঝলাম। যে শত্রুকে আমি মেরেছি তারই সাজসজ্জা আর পদমর্যাদা বিজেতা হিসেবে আমার প্রাপ্য। আমি এখন একজন অধিনায়ক।

মৃত যোদ্ধার জিনিসগুলো নেবার জন্য ঘুরে দাঁড়াতেই দেখলাম টার্স টারকাস সদলবলে এগিয়ে আসছে। আমার দিকে কেমন অদ্ভুতভাবে একদৃষ্টে তাকিয়ে সে জিজ্ঞেস করল—তোমাকে তো সেদিনও দেখলাম বোবা কালার মতো। এরই মধ্যে কি করে বারসুমের ভাষা রপ্ত করলে হে ? কোথায় শিখলে ?

জবাব দিলাম—এর জন্য তুমিই দায়ী টার্স টারকাস। যা একজন শিক্ষয়িত্রী আমায় দিয়েছ, ক্ষমতা বটে তার। আমার এই বিদ্যেটুকুর

জন্য সোলাকে ধন্যবাদ জানাতে হয়।

—ভালোই শিখিয়েছে সোলা। কিন্তু তুমি জানো এই দুই অধিনায়কের কাউকে যদি না মারতে পারতে তাহলে তোমার কপালে কী ঘটত?

হেসে বললাম—তাহলে ওদের মধ্যেই কেউ আমাকে মেরে ফেলত!

—না! সেখানেই তোমার ভুল। একেবারে নিতান্ত আত্মরক্ষার প্রয়োজন ছাড়া মঙ্গলযোদ্ধারা তাদের বন্দীদের হত্যা করে না। আমরা ওদের বাঁচিয়ে রাখতে চাই অন্য উদ্দেশ্যে। টারকাস এমন মুখভঙ্গী করলে যাতে বোঝা যায় পরিণতি মোটেই সুবিধের হত না। এবার সে বললে—কিন্তু একটা উপায়ে তুমি বেঁচে যেতে পার। তোমার বীরত্ব আর ক্ষমতার পরিচয় পেয়ে আমাদের সর্বাধিনায়ক তাল্‌ হাজুস্‌ যদি তোমাকে নিজের সেবার যোগ্য মনে করেন তাহলে তুমি সবুজ জাতের নাগরিক হতে পারবে, পুরোদস্তুর থার্কি বনে যাবে। তাল হাজুসের দরবারে পৌঁছোনো অবধি লোরকাস টোমেলের ইচ্ছা অনুসারে তোমাকে যোগ্য কাজের জন্য সমাদর জানাব আমরা। তোমার প্রতি থার্কি অধিনায়কের মতোই আচরণ করা হবে। আমার বক্তব্য শেষ হল।

আমি জবাব দিলাম—তোমার বক্তব্য শুনলাম টার্স টারকাস্‌। তুমি তো জানো আমি বারসুমের কেউ নই। তোমাদের আচার-বিচার আমার থেকে আলাদা। আমি অতীতে যা করেছি, ভবিষ্যতেও তেমনি করব। একটা বিষয়ে আমাদের দু'পক্ষেরই জেনে রাখা ভাল। এই অভাগী মেয়েটি সম্পর্কে তোমাদের যাই মনোভাব হোক, এর কোনো ক্ষতি কেউ করতে গেলে আগে আমার সঙ্গে মোকাবেলা করতে হবে।

আমার সরাসরি কথায় দেখলাম বেশ কাজ হয়েছে—আমার ওপর ওদের শ্রদ্ধা যেন আরো বেড়েই গেল। টার্স টারকাস নিজেও বেশ খুশি, কিন্তু সে বেশ একটা হেঁয়ালিভরা মন্তব্য করল—থার্ক অধিনায়ক তাল্‌ হাজুসকে আমি তো ভালই চিনি!

দেজা থোরিসের দিকে মনোযাগ ফিরিয়ে আমি তাকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করি। বেরুবার দরজা অবধি সঙ্গে নিয়ে যাই, ওর ডাইনী রক্ষিণীগুলোর পরোয়াও করি না, অন্য নেতাদের উৎসুক নজরকেও গ্রাহ্য করি না। আমিও তো একজন নেতা—অধিনায়ক!

তারপর হেলিয়ামের রাজকুমারী দেজা থোরিস, পৃথিবীর প্রাক্তন অধিবাসী জন কার্টার, আর আমার বিশ্বস্ত বন্ধু উলা বেরিয়ে এলাম টোমেলের সভাকক্ষের নির্বাক স্তব্ধতার ভেতর দিয়ে—নির্বিবাদে!

নয়

॥ নতুন আস্তানায় ॥

বাইরে বেরিয়ে আসতেই দেজার দুই স্ত্রীলোক প্রহরী ছুটে এল। ওকে ফের পাহারায় রাখবার মতলব। দেজা ভয়ে কুঁকড়ে আমার কাঁধ চেপে ধরলে।

আমি হাতের ইশারায় ওদের সরে যেতে বলি। এখন থেকে বন্দিনী থাকবে সোলার হেপাজতে। সারকোজাকেও সাবধান করে দিয়ে বললাম দেজা থোরিসের সঙ্গে সে যদি কোনো রকম খারাপ ব্যবহার করে তাহলে তার ফল হবে কঠিন মৃত্যু।

আমার কড়া কথার ফল ভাল হল না। একে তো এদের জাতের মধ্যে পুরুষ স্ত্রীলোককে হত্যা করে না, মেয়েরাও পুরুষকে মারে না। তার ওপর সারকোজা যেমন ভয়ংকর একটা দৃষ্টি হেনে চলে গেল যার মানে ভবিষ্যতে সে নানা শয়তানী চক্রান্ত করবে।

সোলার সাথে দেখা হতে তাকে বললাম দেজার তদারকের ভার হাতে নিতে। আর সারকোজার আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য অন্যত্র কোথাও আস্তানা খুঁজে নিতেও বললাম সেই সঙ্গে। আমি আলাদা কোনো বাড়িতে পুরুষদের সঙ্গে থাকব।

সোলা আমার হাত থেকে সৈনিকের সাজসজ্জাগুলো নিয়ে আমার বুক আর কাঁধের ওপর ঠিকঠাক করে বেঁধে দিলে।

—জন কার্টার, তুমি তো এখন বড় অধিনায়ক হলে। তোমার হুকুম আমায় মানতেই হবে, অবশ্য এমনিও আমি তোমার কাজ করতে পারলে সুখী। তুমি আজ যার অস্ত্র নিয়েছ সে বেশ নামকরা যোদ্ধা ছিল। শত্রু মেরে পদোন্নতি করে সে টার্স টারকাসের কাছাকাছি এসেছিল। টোমেলের পরেই কিন্তু টারকাসের স্থান। তুমি হলে এগারো নম্বর। আমাদের সবুজ জাতের মধ্যে তোমার আগে রইল আর দশ জন উঁচু পদের নায়ক।

—লোরকাস্ টোমেলকে যদি মেরে দি' ?—রহস্য করে বললাম।

—তুমি হবে প্রধান, কিন্তু সে-পদ পেতে হলে সভাসদদের অনুমতি নিয়ে তাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে মারতে হবে। অবশ্য সে যদি তোমায় অন্য কোথাও আক্রমণ করে তুমি আত্মরক্ষার জন্য তাকে মারতে পারো, তাহলেও তার পদ তুমি পাবে।

আমি হেসে ফেলি। টোমেলকে মারার আমার কোনো ইচ্ছে নেই। দরকারও নেই থার্ক্‌দের প্রধান নায়ক বনবার। সোলা আর দেজা থোরিস্‌কে নিয়ে ওদের নতুন আস্তানা খুঁজতে বেরুই। সভা-প্রাসাদের কাছেই একটা বাড়ি পেয়ে যাই। আগের বাড়ির চেয়েও বেশি জাঁকজমক এ বাড়িটায়। এখানে সত্যিকারের শোবার ঘর, মস্ত সব সেকেলে ঝোলানো পালংক—মার্বেল পাথরের ছাদ থেকে লম্বা সোনার শেকলে বাঁধা। দেয়ালে প্রচুর কারুকাজ। আর ঘরের ছবিগুলোতে অনেক মানুষজাতীয় প্রাণীর মূর্তি আঁকা। মানুষগুলো আমারই মতো, দেজা থোরিসের চেয়ে ফর্সা। সুন্দর পোশাক পরনে, ধাতু রত্নের অলংকার, মাথায় প্রচুর সুন্দর চুল। বেশির ভাগ মানুষই খেলাধুলা নিয়ে আছে। দেজা থোরিস তো মুগ্ধ বিস্ময়ে চেয়ে রইল। অবলুপ্ত অতীতের মানুষদের হাতে গড়া অপূর্ব শিল্পকর্ম। সোলার অবশ্য এদিকে কোনো নজরই নেই।

ওরা ঠিক করল এ ঘরটা নেবে আর পাশের কামরায় রান্নাঘর জিনিসপত্র রাখার ব্যবস্থা হবে। সোলাকে পাঠালাম বিছানা বাসনপত্র প্রয়োজনীয় খাবার নিয়ে আসতে। আমিই ততোক্ষণ দেজাকে পাহারা দেব।

সোলা চলে যেতে আমার দিকে ফিরে মৃদু হেসে দেজা বললে—তুমি চলে গেলে তোমার বন্দিনীর কি পালাবার জায়গা আছে কোথাও? তোমার পাহারাও যা, আশ্রয়ও তা, আমার কাছে একই কথা। এই সুযোগে তোমার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি এ কটা দিন তোমার সম্পর্কে অত্যন্ত বিরূপ ধারণা মনে রেখেছিলাম বলে।

—ঠিকই বলেছ তুমি। পালাতেই যদি হয় দুজনকেই একসঙ্গে পালাতে হবে। একার কাজ নয়।

—তুমি টার্স টারকাস্ নামে ও জীবটাকে যে কথাগুলো বললে তাতে এদের মধ্যে তোমার অদ্ভুত অবস্থাটা তো বুঝতে পারলাম, কিন্তু তুমি বারসুমের মানুষ নও এ-কথাটা বলার মানে কী?

—আমি এসেছি পৃথিবী গ্রহ থেকে। ওখানেই আমার দেশ। আমি ঠিকই বলেছি, আমি তোমাদের কোনো জাতেরই নই।

মেয়েটিকে বিশ্বাস করাবার জন্য এত অধীর হয়ে উঠলাম কেন তাই ভাবছিলাম। ও বিশ্বাস করল বা নাই করল, তাতে আমার কী আসে যায়? ওই সরল সুন্দর চোখের আকর্ষণ? সেও যেন তেমনি কিছু ভাবছিল। বলল—তোমার কথায় আমি বিশ্বাস করি জন কার্টার। কিন্তু তোমার এই দেশটা কোথায়?

—আমি আরেক মস্ত গ্রহের মানুষ। পৃথিবী। তোমাদের এই বারসুম, যাকে আমরা মঙ্গলগ্রহ বলি, তার পরেই পৃথিবী। দু' গ্রহই সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘুরছে। কীভাবে যে এখানে এসে পড়লাম তা আমি তোমাকে বোঝাতে পারব না, নিজেও ঠিক জানি না। তবে আমি এখানে এসেছি। আর দেজা থোরিসের কোনো উপকারে আসতে পেরে ধন্যও হয়েছি!

ও কী বুঝল জানি না। তবে মুখে বলল—বুঝি আর না বুঝি, তোমাকে বিশ্বাস করতেই হবে। তুমি আমাদেরই মতো, অথচ আলাদা। কিন্তু বৃথা মাথা ঘামিয়ে লাভ কী? মন বলছে তাই বিশ্বাস করছি।

এ তো পৃথিবীর পুরনো মেয়েলি যুক্তি! এর পর যখন সাধারণ কথাবার্তায় এসে পড়ি দেখলাম পৃথিবীর বিষয়ে ওর দারুণ কৌতূহল। শুধু তাই নয়, জানেও অনেকে কিছু! পৃথিবী সম্পর্কে এত কিছু খবর ও কীভাবে রাখল, খুঁটিয়ে প্রশ্ন করতে ও হেসে উঠল।

—আহা, বারসুমের সব বিদ্যালয়ের শিশুরাই তো এসব জানে। আমাদের মতো তোমাদের গ্রহেরও ইতিহাস ভূগোল সবকিছু। পৃথিবীর ওপর যা ঘটছে সে তো আমরা দেখতেই পাই স্বচক্ষে। চোখের সামনেই তো আকাশে ঝুলছে তোমাদের পৃথিবী, তাই না?

এবার আমি ফাঁপরে পড়েছি। ও তখন বুঝিয়ে বললে যে হেলিয়ামে

ওদের নানা রকমের যন্ত্র আছে যেগুলো ওরা বহুযুগ ধরে ব্যবহার করছে, সেগুলোর উন্নতিও করেছে—সেই যন্ত্রগুলোর মারফত পর্দার ওপর পরিষ্কার ফুটে ওঠে অন্য সব গ্রহের ছবি, সে সব গ্রহে যা কিছু ঘটছে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ দৃশ্য। সে সব ছবি এত নিখুঁত যে ফোটো তুলে বড়ো করে দেখলে সামান্য একটা ঘাসের শীষও পরিষ্কার চেনা যাবে। পরে অবশ্য আমি নিজেও হেলিয়ামে গিয়ে দেখেছি এইসব ছবি আর ওই যন্ত্রপাতি-গুলো, যার সাহায্যে এই ছবি ওরা তোলে।

প্রশ্ন করলাম—পৃথিবীর সব কিছু যদি এতই ভালো জানো তোমরা তো আমাকে চিনতে পারলে না কেন সে গ্রহের বাসিন্দা বলে ?

ও জবাব দিলে—তার কারণ হল এমন অনেক গ্রহ আছে যাদের প্রায় বারসুমের মতোই আবহাওয়া মণ্ডল, জীবনের নানা রূপও আমাদেরই কাছাকাছি। মোটামুটি সব জায়গাতেই একই রকম, আলাদা চিনে রাখা মুশকিল। তা ছাড়া তোমাদের পৃথিবীর মানুষরা বেশির ভাগই কাপড় জামা দিয়ে গা ঢেকে রাখে। অনেকে আবার মাথাও ঢাকে—কেন তা ভগবানই জানেন। এদিকে তুমি যখন থার্কের যোদ্ধাদের হাতে পড়লে তখন তোমার কোনো পোশাকই ছিল না।

এর পর আমি যখন দেজা থোরিসকে বলতে শুরু করেছি, কেমন করে আমার পুরো পোশাকপরা শরীরটাকেই পৃথিবীতে ছেড়ে চলে এসেছি, সেই সময় সোলা ফিরে এল তার পোষা বাচ্চাটিকে সঙ্গে নিয়ে।

সোলা এসেই জিজ্ঞেস করলে আমাদের সঙ্গে কেউ দেখা করতে এসেছিল কি না। কেউ আসেনি বলতে ও একটু অবাক্ হল। আসলে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে ও সারকোজাকে দেখেছিল এ-বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে। আমরা ধরে নিলাম, নিশ্চয় সারকোজা চুপিসারে এসে-ছিল কোনো মতলবে। যাহোক ব্যাপারটা আমরা তখনকার মতো ভুলেই গেলাম।

কামরাগুলোতে ঘুরে ঘুরে আমি আর দেজা কারুকাজ আর সাজ-সজ্জার অলংকরণ দেখছি। দেজার মুখে শুনলাম প্রায় লক্ষ বছর আগে মঙ্গলের সভ্যতা গৌরবের তুঙ্গে পৌঁছে গিয়েছিল এই প্রাচীন মানুষদের

যুগে। এদেরই বংশাবতংস হল দেজাদের তামাটে লাল জাত—মঙ্গলের আদিম কালো মানুষ আর হলদে-লাল মানুষের সংমিশ্রণের ফল। তারাও সে-সময় খুব উন্নতি করেছিল। মঙ্গলের সভ্য জাতিগুলোর তাই তিন শাখা। এ গ্রহের জল-হাওয়া এমন ভাবে শুকিয়ে যাচ্ছিল যে ক্রমে ছোট-হয়ে-আসা অল্প কিছু উর্বর ভূমিতেই ওদের বসবাস করতে হয় নিজেদের মধ্যে বন্ধুত্ব বজায় রেখে। সবুজ রঙের প্রাণীগুলোর সঙ্গে অনবরত যুদ্ধ করতে হত আত্মরক্ষার জন্য। প্রকৃতির সঙ্গে ক্রমাগত লড়াই আর নিজেদের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহে অতো বড়ো প্রাচীন সভ্যতা ক্রমশ ক্ষয় পেয়ে গেল—শিল্প সৌকর্যের বিকাশও মুছে গেল মঙ্গল থেকে।

এই যে-শহরে এখন সবুজ দানবরা ঘাঁটি করেছে এর নাম ছিল কোরাদ। সুন্দর পাহাড়ঘেরা সমুদ্রপারের বন্দর। এখনকার গিরি-খাতটা আসলে ছিল মোহানা, সমুদ্রপথ থেকে একেবারে ফটক অবধি জাহাজ আসত, বাণিজ্য হত। সমুদ্রের তীর ধরে অনেক শহর বন্দর গড়ে উঠেছিল। সমুদ্র সরে যাবার সঙ্গে ক্রমাগত শুকনো চড়ার দিকে এগিয়ে ছোট-ছোট শহর বানাতে হয়। শেষে পরিকল্পনা বদলে তাদের লম্বা লম্বা খাল খুঁড়তে হয়, যেগুলোকে আমরা মঙ্গলের তথাকথিত 'ক্যানাল' বলে জানি।

কথায় কথায় আমরা টেরই পাইনি বেলা কত গড়িয়ে গেছে। একজন বার্তাবাহক এসে জানালে লোরকাস্ টোমেল আমায় তলব করেছে জরুরি কাজে। দেজা আর সোলার কাছে বিদায় নিয়ে তাড়াতাড়ি হাজির হলাম সভা-প্রাসাদে। টোমেল আর টারকাস্ দুজনেই রয়েছে সেখানে।

দশ

॥ বন্দী হলেও ক্ষমতাশালী ॥

লোরকাস্ টোমেল তার কঠোর চোখের দৃষ্টি আমার চোখের ওপর রেখে বললে—শোনো হে জন কার্টার! মাত্র এই কটা দিন তুমি এসেছ, অথচ এর মধ্যেই নিজের শক্তির বলে আমাদের মধ্যে উঁচু আসন দখল করে নিয়েছ। কিন্তু তবু তুমি আমাদের নও, আমাদের মেনে চলার বাধ্যবাধ্যকতা তোমার নেই।...এক বিচিত্র অবস্থায় আছ তুমি; তুমি বন্দী অথচ তোমার হুকুম মানতে সবাই বাধ্য। তুমি বিদেশী বহিরাগত অথচ থার্কিদের অধিনায়ক। ছোটখাটো বামন মানুষ হলেও শক্তি-শালী মহাযোদ্ধাদের এক মুষ্টির আঘাতে মেরে ফেলতে পার। আর এখন খবর পাচ্ছি বারসুমেরই অন্য এক জাতের বন্দীকে নিয়ে তুমি নাকি পালাবার সুযোগ খুঁজছ।...এ অভিযোগ যদি সত্য প্রমাণিত হয় তাহলে তোমাকে প্রাণদণ্ড দেবার যথেষ্ট ভিত্তি খুঁজে পাব। তবে আমরা ন্যায়-বিচারে বিশ্বাসী। তাই আমরা থার্ক দেশে ফিরে গেলেই তোমার বিচার হবে, অবশ্য তাল হাজুস্ যদি তাই আদেশ করেন। তাল হাজুস্ আমাদের জেডাক, সর্বাধিনায়ক!—এইটুকু বলার পর হিংস্র কণ্ঠে চিবিয়ে চিবিয়ে টোমেল কথাগুলো বললে—তুমি যদি এই লাল জাতের মেয়েটির সঙ্গে পালাও, তাহলে তাল হাজুসের কাছে জবাবদিহি করতে হবে আমাকেই। টার্স টারকাসের সঙ্গেও আমাকে মোকাবেলা করতে হবে তখন—হয় প্রমাণ দিতে হবে আমি প্রধান দলপতি থাকার যোগ্য, নতুবা আমার মৃতদেহের রণসাজ চড়বে আমার চেয়েও যোগ্যতর কোনো বীরের শরীরে।...টার্স টারকাসের সঙ্গে আমার ঝগড়া নেই। আমরা দুজনে মিলে সবুজ প্রাণীদের সবচেয়ে বড় জাতটিকে শাসন করি। আমরা নিজেদের মধ্যে লড়তে চাই না, তাই তুমি মরে গেলে আমাদের সব দিকে পরিত্রাণ! কিন্তু তাল হাজুসের আদেশের অপেক্ষা না করে আগেই তোমাকে হত্যা করা যেতে পারে মাত্র দুটি উপায়ে। এক, যদি তুমি আমাদের কাউকে আক্রমণ কর তাহলে আত্মরক্ষার খাতিরে;

ছুই, যদি তুমি পালাতে চেষ্টা কর। আগেই তোমায় সাবধান করে দিচ্ছি, এই ছুটো সুযোগের যে কোনো একটি পেলেই তোমাকে সাবাড় করে আমরা দায়মুক্ত হব। তাল হাজুসের কাছে মেয়েটিকে বিনা ঝামেলায় পৌঁছে দেওয়াই আমাদের এখন প্রধান কাজ। গত হাজার বছরের মধ্যেও এমন একটি মূল্যবান বন্দী থার্করা যোগাড় করতে পারেনি—লালদের শ্রেষ্ঠ নায়কের পৌত্রী সে। আমাদের চরম শত্রু হল এই জাতটা। যা হোক তুমি এবার যেতে পারো।

সভা-ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে ভাবলাম, এই শুরু হচ্ছে সারকোজার চক্রান্ত। লোরকাসের কানে এসব খবর সে ছাড়া আর কে দেবে এত তাড়াতাড়ি? মনে পড়ল সকালে দেজা আর আমি যা আলোচনা করছিলাম তার মধ্যে পালাবার কথাও একটু হয়েছিল বৈকি! সারকোজা আজকাল টারকাসের একান্ত বিশ্বাসভাজন, তাদের নানা চক্রান্তের অন্তরালেই তার অস্তিত্ব।

টোমেলের হুমকিতে পালাবার কথা ভুলে যাবার বদলে আরো দৃঢ় বিশ্বাস হল পালানো ছাড়া গত্যন্তর নেই। বিশেষ করে দেজার কথা ভেবে। জেডাক তাল হাজুসের দরবারে তার জন্য কোন্ ভাগ্য অপেক্ষা করছে চিন্তা করলেও ভয় হয়। সোলার মুখে শুনেছি জীবটা মূর্তিমান শয়তান। পাশবিক, নিষ্ঠুর, ভয়ংকর একটি পশু দানব।

নগর-চত্বরের কাছে এসব কথা ভাবতে ভাবতে হেঁটে যাচ্ছি এমন সময় টার্স টারকাস বেরিয়ে এসেছে। যেন কিছুই হয়নি ভাব করে আমার দিকে এগিয়ে এসে বললে—তোমার আস্তানা কোথায় জন কার্টার?

—এখনো কোথাও ঢুকিনি। ভাবলাম অন্য যোদ্ধাদের সঙ্গে থাকাই এখন আমার পক্ষে ঠিক, তাই তোমাকে একটু জিজ্ঞেস করে নেবো ভাবছিলাম।

—আমার সঙ্গে এসো। বলে সে আমাকে নিয়ে চলল চত্বরের উল্টোদিকের একটা বাড়িতে। দেখলুম সোলাদের নতুন আস্তানার ঠিক পাশেই। ভালই হল। টারকাস বললে—এ বাড়ির একতলায়

আমি আছি। দোতলাটা পুরো সেপাইদের দখলে। তবে তিনতলা থেকে ওপরের সব খালি রয়েছে, এরই মধ্যে বেছে নাও।...শুনলাম তুমি সোলাকে ভার দিয়েছ বন্দী মেয়েটার। তা যাহোক, তোমার ব্যাপার আমাদের সঙ্গে মেলে না। অধিনায়ক হিসেবে তোমার পরিচারিকা রাখতে হবে, এইটেই নিয়ম। যাদের পদ তুমি দখল করেছ, তাদের অনুচর পরিচারিকাদের সবাইকেই তুমি কাছে রাখতে পার।

ধন্যবাদ জানিয়ে বললাম সে দরকার নেই, তবে খাবার তৈরি করার কেউ হলে মন্দ হয় না। টারকাস্ বললে সে এখুনি লোক পাঠিয়ে দেবে। তারাই সঙ্গে আমার বিছানার সিল্ক আর পশমও নিয়ে আসবে।

টারকাস্ চলে যাবার পর একাই তেতলার সিঁড়ি দিয়ে উঠে ঘরগুলো দেখি। একেবারে সামনের ঘরটা দেজা-সোলাদের পাশেই পড়েছে! সব মিলিয়ে দেখি দশখানা কামরা।

একটু বাদে দল বেঁধে এল পরিচারিকারা, সঙ্গে যাবতায় রসদপত্র। দেখে বুঝলাম এর মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণ উড়োজাহাজের লুটের মালও রয়েছে। এ সবই আমার প্রাক্তন মৃত প্রতিদ্বন্দ্বীদের সম্পত্তি। দুটি দলে মিলে প্রায় জনা পনের স্ত্রীলোক আর বালকবালিকা। সবই ওই দুজন নায়কের অনুচর দল।

দাস-দাসী বলতে যা বোঝায় এরা কিন্তু তা নয়। পরিবারও নয়, কোনো সম্পর্কও নয়। সবুজ মঙ্গলবাসীদের সম্পত্তি হল সাধারণ সম্পত্তি, শুধু ব্যক্তিগত অস্ত্রশস্ত্র, গহনা আর বিছানাপত্র ছাড়া। কোনো পুরুষ যোদ্ধার অনুচররা সামরিক দলের মতো তার ওপরেই নির্ভর করে চলে।

যখন দেখলাম আমি চাই আর না-চাই এদের দায়িত্ব আমারই ওপর, তখন সিধেই ওদের বলে দিলাম, ওপরের চারতলার সমস্ত ঘর দখল করে যে-যেমন খুশি থাকুক, আমি একা থাকব তেতলার ঘরগুলোয়। তারপর থেকে আর ওদের দেখতামও না, ধারও ধারতাম না কোনো।

উড়োজাহাজের যুদ্ধের পর আরো বেশ কিছুদিন শহরেই রয়ে গেল

এরা। স্বদেশযাত্রা স্থগিত রইল যতদিন না পুরো ভরসা পায় বিমান আক্রমণ আর হবে না। অলসভাবে দিনগুলো কাটবার সময় টার্স টারকাস্ আমাকে যুদ্ধবিদ্যার নানা কায়দা কানুন শেখালে—বিশেষ করে থার্কিদের কায়দায় দানব-ঘোড়াগুলোকে কীভাবে বশ করতে হয়। দানব-ঘোড়াগুলোকে ওরা বলে থোট্।

থোট্গুলো এমনিতে অত ভয়ংকর হলেও বাগ মানে না তা নয়। আমার ভাগ্যে জুটেছিল দুটো জীব, পূর্বতন মালিক নায়কদের উত্তরাধিকার হিসেবে। আমার কাছে বশ মানতে ওদের বেশি সময় লাগেনি। অতিমানসিক শক্তি দিয়ে কায়দা না করতে পারলে ওরা থোটের মাথার ওপর, ঠিক মাঝখানটায়, মারে পিস্তলের বাঁটের ডাঙস। যতক্ষণ না বশ মানে, সমানে মেরে যায় মাথায়। অনেক সময় ওরা সওয়ারকে উলটেও ফেলে দেয় মাটিতে। তখন চলে সওয়ার আর জানোয়ারে লড়াই। হয় পিস্তলের গুলিতে থোট মরে, নয়তো দানব যোদ্ধার ছিন্নভিন্ন দেহ চিতায় সাজিয়ে পরিচারিকারা জ্বালিয়ে দেয় থার্কি নিয়ম মতো।

উলার ওপর দিয়ে আমার যে আগের অভিজ্ঞতা হয়েছিল, মানে দয়া ভালবাসা দেখিয়ে বশ করা, সেই কৌশলই প্রয়োগ করি আমি। থোটদের আগে দেখিয়ে দিই আমাকে পিঠ থেকে ফেলে দেওয়া অত সোজা নয়—দরকার পড়লে পিস্তলের বাঁট দিয়ে মারের পর মার কষিয়ে। তারপর ধীরে ধীরে আমার পৃথিবীতে শেখা ঘোড়া-বশ করার কৌশল চালিয়ে ওদের মনটাকে আমার দিকে টেনে আনি যাতে আমায় বিশ্বাস করতে শেখে।

মানুষের মতো সদয় ব্যবহার পেয়ে যে কোনো পশুর মতো ওরাও দুদিনে আমার তাঁবে এসে যায়। মঙ্গলের সবুজ দানবগুলো অবাক হয়ে যায় ফলাফল দেখে। থোটগুলো পোষা কুকুরের মতো আমার সঙ্গে ঘোরে, আদর করে বিরাট গাল দিয়ে আমার গাল ঘসে, যা বলি তাই শোনে। সবুজ প্রাণীরা ভাবে এ আমার পৃথিবীরই কোনো জাদু, যা ওদের একেবারে অজানা।

টার্স টারকাস্ একদিন কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করতে আমি ওই কথাই বলি—জানো টারকাস্, যোদ্ধার কাছেও নরম ভাবসাবের দাম আছে, কেবল কব্জির জোর থাকলেই হয় না। তোমাদের কাছে শুনি যুদ্ধের মাঠেই নাকি হঠাৎ তোমাদের থোট্গুলো খেপে গিয়ে উলটো পাল্টা ছুটে পালায়, কথা শোনে না। জেতা যুদ্ধও নাকি অনেক সময় হেরে যাও তোমরা! আমি বলি কি, তোমার সেপাইদের শেখাও আমার কায়দা।

—দেখাও দেখি তোমার কায়দা।

আমি ব্যাখ্যা করে তাকে বোঝাই থোট্দের শিক্ষা দেবার প্রণালী। ওর তাগাদায় পড়ে লোরকাস্ আর তার সঙ্গী যোদ্ধাদেরও দেখাতে হয় আমার তালিমের কৌশল। এইভাবে শুরু হল বেচারী থোট্দের এক এক নতুন জীবন। লোরকাসের সম্প্রদায় ত্যাগ করে চলে যাবার আগে অন্তত এটুকু উন্নতি ওদের জন্য আমি করে দিয়েছিলাম। লোরকাসও এত খুশি হয়েছিল যে আমাকে তার পায়ের সোনার বলয় খুলে উপহার দিয়েছিল।

এগারো

॥ মারাত্মক বেইমানি ॥

দিন সাতেক বিশ্রামের পর আমাদের যাত্রা শুরু হল থার্ক দেশের উদ্দেশে। এ ক'দিন দেজা থোরিসের সঙ্গে তেমন দেখাসাক্ষাৎ হয়নি। শুধু একদিন তাকে আর সোলাকে সাবধান করে দিয়েছিলাম যেন বাড়ির বাইরে বেড়াতে গিয়ে সাদা গরিলাদের খপ্পরে না পড়ে। তবে উলা পাহারায় থাকতে অতো ভয়ের কারণ ছিল না।

একদিন রাস্তায় দেখা হতে দেজা ঠাট্টা করে বলল—শুনলাম তুমি নাকি পুরোদস্তুর থার্কি সেনানায়ক বনে গেছ? সারকোজা বলেছে এখন থেকে তোমাকে বেশি দেখতে পাব না?

সারকোজা এক নম্বর মিথ্যেবাদী একথা আমি বলতে দেজা হেসে ফেললে।

—আমি জানি তুমি ওদের দলের একজন কেউকেটা হলেও আমার খাঁটি বন্ধু। 'যোদ্ধাদের হাতিয়ার বদল হতে পারে, কিন্তু মন বদলায় না' এ হল বারসুমেরই চালু কথা। ... ওদের মতলব হল আমাদের আলাদা করে রাখা। তাই এই ক'দিন আমাকে ওরা কাজ দিয়েছিল মাটির নিচের কুঠরিতে। সেখানে ওদের বিশ্রি রেডিয়াম বারুদের কারখানা। এ সব বারুদ আর বিস্ফোরক তো কৃত্রিম আলোতে বানাতে হয়, সূর্যের আলো লাগলেই ফেটে যাবে। তুমি জানতে এসব?

—দেজা, তোমার সঙ্গে ওরা দুর্ব্যবহার কিছু করেনি তো?

—যৎসামান্য। তা, ওরা তো জানে আমার ঠাকুরদার দশ হাজার সেনাপতি। আমার কুলপঞ্জী খুঁজলে সিধেসিধি এমন এক পূর্বপুরুষকে পাওয়া যাবে যিনি প্রথম মঙ্গলগ্রহের জলপথের স্রষ্টা। এরা তো এদের মায়ের নামই জানে না। তাই আমার ওপর হিংসে।

—তা ঠিক দেজা থোরিস্, যতোটা মানানো যায় মানিয়ে চলব আমরা। কিন্তু কখনো তোমার দিকে কোনো মঙ্গলের জীব—তা সে সবুজ, লাল, গোলাপী, বেগুনী যাই হোক—ভুরু কুঁচকে তাকালেও

আমি উচিত শিক্ষা দিয়ে দেব।

খুশি হয়ে হেসে দেজা আমার কঠোর থার্কি-যোদ্ধার চেহারার আড়ালে নরম দয়ালু মনটা নিয়ে খুব ঠাট্টা করলে।

—হঠাৎ যদি কোনো শত্রুকেও জখম করে বস, তাহলে বোধহয় তুমি তাকে ঘরে নিয়ে চিকিৎসা করে সারিয়ে তুলবে, তাই না?

জবাব দিলাম—নিশ্চয়। পৃথিবীতে আমরা তেমনি তো করে থাকি। অন্তত সভ্য মানুষদের মধ্যে।

দেজা ফের হাসে। কিছুতেই ওর মাথায় এটা ঢোকে না—নানা কোমলতা, মেয়েসুলভ সদ্‌গুণ থাকা সত্ত্বেও। সে যে মঙ্গলেরই কন্যা। ওদের কাছে দুশমন তো দুশমনই।

নানা কথা বলতে-বলতে সন্ধ্যা নেমে আসে। আকাশে দু'টো চাঁদই উঠেছে এখন। শীত করছে বিলক্ষণ। আমার গায়ের সিল্ক আঙ্‌রাখাটা ওর কাঁধে চাপিয়ে দিয়ে ঘরে ফিরে আসি যে যার মতো।

ঘরে বসে চুপচাপ দেজার কথাই মনে হচ্ছিল। কী আশ্চর্য! পৃথিবীবাসীর চোখে অস্বাভাবিক ডিম ফুটে বেরিয়ে আসা একটি মানব-কন্যা। যার বয়েস এককালে হাজার বছরে গিয়ে ঠেকবে। অজানা অদ্ভুত আদব-কায়দা ধ্যান-ধারণা ওদের জাতের। মানুষ গোষ্ঠীর প্রাণী সেও, কিন্তু কতো আলাদা! আশা আকাঙ্ক্ষা চিন্তা অভ্যাস সবই ভিন্ন। তবু যেন একটা আত্মীয়তার আকর্ষণ অনুভব করি। ব্যাপারটা তবু রহস্যই থেকে যায়।

পরদিন ভোরবেলাটা যেন শুরু থেকেই প্রচণ্ড রোদ-ঝলসানো। শুধু শীতকালের ছটি সপ্তাহ মঙ্গলের মেরু এলাকায় বরফ জমে, এ ছাড়া বাকি সারা বছরই এমনি গরম। আমাদের অভিযান এখুনি শুরু হবে।

দেজা-সোলাদের রথ সাজানো হল কিনা দেখতে বেরিয়েছি। ওদের রেশম আর পশমের আসন শয্যা গুছিয়ে দিচ্ছি এমন সময় হঠাৎ নজরে পড়ল দেজা থোরিসের পায়ের সঙ্গে একটা ভারি শেকল বাঁধা রথের একটি আংটার সঙ্গে।

সভয়ে সোলার মুখের দিকে ফিরে চেঁচিয়ে বললাম—এর মানে কী?

বিমর্ষ মুখে সোলা বললে—বুদ্ধিটা সারকোজার। দেজা গুম হয়ে বসে আছে কোনো কারণে। ভাল করে দেখি দেজার পায়ের সঙ্গে কড়াটা স্প্রিং-এর তালা দিয়ে আঁটা।

—তালার চাবিটা কোথায় সোলা? দাও তো আমাকে!

—সারকোজার কাছে। সোলার গলার স্বরে বোঝা যায় সেও ব্যাপারটায় অসন্তুষ্ট।

আমি টার্স টারকাসকে খুঁজে বের করে দেজার অকারণ অপমানের বিরুদ্ধে ঘোরতর আপত্তি জানালাম। সে জবাব দিলে—দেখ জন কার্টার, তোমাদের দুজনের পালাবার মতলব থাকলে এই যাত্রার সময়টাই সবচেয়ে বড়ো সুযোগ। তোমাকে ছাড়া মেয়েটা একা পালাতে পারবে না, তাই এই সহজ ব্যবস্থা।

বুঝলাম আপত্তি করে ফল হবে না, তাই বললাম, চাবিটা অন্তত সারকোজার হাত থেকে কেড়ে নেয়া হোক আর তার ওপর হুকুম থাক [illegible] সে বন্দিনীকে বিরক্ত না করে।

—এটুকু আশা করি অন্তত তুমি করবে টার্স টারকাস, আমাদের বন্ধুত্বের [illegible]।

—বন্ধুত্ব! বন্ধুত্ব বলে কিছু নেই। তবে তোমার মর্জি হয়েছে, আমি সারকোজাকে মানা করে দেব। চাবিটাও থাকবে আমার কাছে।

—চাবি তুমি আমার দায়িত্বেও রাখতে পার, যদি চাও···

—তাল হাজুসের দরবার অবধি পৌঁছোনোর আগে যদি তোমরা কথা দাও পালাবার চেষ্টা করবে না, তাহলে ইস্ নদীর জলে শেকলটা ফেলে দিয়ে নিজের কাছে চাবি রাখতে পার।

—তাহলে তোমার কাছেই থাক্ চাবি···দরকার নেই।

টার্স একটু হাসলে কিন্তু জবাব দিলে না। রাতের বেলা কিন্তু শিবিরে ঢুকতে গিয়ে দেখলাম ও নিজেই দেজা থোরিসের পায়ের শেকলের বাঁধন খুলে দিচ্ছে। বরাবরই দেখছি আপাতনিষ্ঠুর কঠিনতার

মধ্যেও টার্স টারকাসের মনের মধ্যে কিছু একটা লুকিয়ে আছে যা ও জোর করে চাপা দিয়ে রাখে। সেটা কি স্বজাতির ভয়ানক জীবনধারার বিরুদ্ধে ওর অন্তরের কোনো অসন্তোষ যা ওর পূর্বপুরুষদের সুস্থ সহজাত মানবিক চেতনারই চিহ্ন?

দেজার রথের পাশ দিয়ে হেঁটে যাবার সময় লক্ষ্য করলাম সারকোজার কুটিল চোখে যেন বিষাক্ত দৃষ্টি ঝরে পড়ছে। আমি কিন্তু খুশিই হলাম এতে। খানিক বাদেই আবার দেখি সে একটা বিশালদেহী জানোয়ার-যোদ্ধার সঙ্গে কী যেন গভীর সলাপরামর্শ করছে। দানবটার নাম জাদ্। এখন অবধি কোনো যোদ্ধা নায়ককে মারতে পারেনি বলে কোনো পদবী বা উপাধি নেই নামের সঙ্গে। এদের কানুন মাফিক আমার নামের সঙ্গে এর মধ্যেই দুটো আরো নামের পদবী জুড়ে গেছে। সারকোজার সঙ্গে কথা বলতে-বলতে জাদ্ কেবলি ফিরে ফিরে দেখছে আমাকে। তখনকার মতো আমি তেমন মন না দিলেও পরের দিন ভালো করেই বুঝেছিলাম ব্যাপারখানা।

খুব ভোর থাকতেই রওনা হয়ে আমরা পথে একটিমাত্র জায়গায় থেমেছিলাম। পথে দুটো ঘটনা ঘটল যা মনে রাখার মতো। দুপুর নাগাদ আমরা একটা জায়গা দিয়ে চলেছি, মনে হল একটা ডিম-ফুটনাগার দূর থেকে দেখা যাচ্ছে। লোরকাস্ আর টারকাস গেল চাক্ষুষ পরীক্ষা করে দেখতে। সঙ্গে ডজন খানেক সেপাইয়ের সঙ্গে আমিও চললাম।

সত্যিই সেটা ফুটনাগার, কিন্তু ডিমগুলো খুব ছোট-ছোট, আমার আগের দেখা ডিমগুলোর মতো নয়। টারকাস বলল এটা আরেক সবুজ দানব-জাত বারহুনদের ডিম। সবে দেয়াল বানিয়ে গেছে, এখনো তাই কাঁচা। তার মানে বারহুন যোদ্ধাদের দল বেশি দূরে চলে যায়নি এখনো। টারকাসের চকচকে চোখে তখন লড়াইয়ের লোভ জেগে উঠেছে।

সংক্ষেপে এখানকার কাজ সারা হল অর্থাৎ সেপাইরা গায়ের জোরে পাঁচিল ভেঙে হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে ছোট-ছোট ভোজালি দিয়ে সমস্ত ডিম ধ্বংস করে ফেলল। তারপর সবাই আবার ফিরে এলাম নিজেদের

শিবিরে। টারকাসকে জিজ্ঞেস করেছিলাম বারহুনরা কি বেঁটে খাটো প্রাণী যে তাদের ডিমগুলো অত ছোট? ও বলেছিল তা নয়, ডিমগুলো ওরা সবে রেখে গেছে। সবুজ প্রাণীদের সকলের ডিমই গোড়াতে ওই-রকম ছোট থাকে। পাঁচ বছর ধরে 'তা' দিতে দিতে প্রমাণ আকারের হয়ে দাঁড়াবে। যাক্ আমার মনের একটা পুরনো কৌতূহল এবার মিটল।

এরপর ঘটল দ্বিতীয় ঘটনাটা। আমরা শিবিরে খানিকক্ষণ থেমে জানোয়ারদের একটু বিশ্রাম দেব। আমার থোটের জিন-সাজগুলো খুলে দু'নম্বর থোটটার পিঠে চড়িয়ে দিচ্ছি এমন সময় মুশ্‌কো জোয়ান জাদ্ পেছন থেকে এসে এক লম্বা তরোয়ালের ঘা বসালে আমার থোটের গায়ে।

সমুচিত জবাব দেবার জন্য মঙ্গলের আদব-কায়দা জানার দরকার হয়নি আমার। মাথায় যেমন রাগ চড়ে গিয়েছিল, হয়তো পিস্তল বের করে জানোয়ারটাকে গুলি করেই শেষ করে দিতাম। কিন্তু তার আগেই ও তরোয়ালটা উঁচিয়ে ধরেছে। তার মানে তার সঙ্গে লড়তে হলে তরোয়ালই ব্যবহার করতে হবে। ছোরা চলতে পারে, কিন্তু পিস্তল বা বড় কোনো অস্ত্র নয়। দ্বৈরথ যুদ্ধের এই নিয়ম।

লম্বা তরোয়ালই বেছে নিলাম আমি। দানবটার ধারণায় এ অস্ত্র [illegible] ও [illegible]। লড়াই যখন শুরু হল, চারপাশে গোল হয়ে ঘিরে [illegible] প্রত্যেকটি প্রাণী। প্রথম দিকে জাদ্ আমাকে গোঁয়ারের মতো তাড়া করে বেড়ালো—মত্ত ষাঁড় যেমন ঢুঁ মারতে যায়। আমি ওর তুলনায় অনেক বেশি চট্‌পটে। একেকবার সাঁৎ করে পাশ কাটিয়ে যাই আর ও হুমড়ি খেয়ে ছুটে যায় সামনে। সেই ফাঁকে দু'চারটে ঘা কষিয়ে ওর ছাল ছামড়া খসিয়ে দি'। ছোট জখমগুলো থেকে সারা গায়ে তখন রক্ত ঝরছে জানোয়ারটার। কিন্তু তবু আমি তেমন ফাঁক পাচ্ছি না বড়সড় মারাত্মক আঘাত হানার।

এবার ও কৌশল বদলে অতি সন্তর্পণে নিপুণ হাতে লড়তে শুরু করল। কেবল শক্তির ওপর ভরসা না করে বুদ্ধি খেলিয়ে একেকটা আঘাত করছে। মানতে বাধ্য হলাম তরোয়ালের ওপর সত্যিকার দখল

আছে দানবটার। নেহাৎ আমার সহনশক্তি বেশি, মঙ্গলের মাধ্যাকর্ষণের কল্যাণে আমার গতিবিধিও ক্ষিপ্র—না হলে আমার টিঁকে থাকা মুশকিল হত। দু'জনেই আঙিনাটা একেকবার চক্কোর দিচ্ছি কিন্তু মোক্ষম আঘাত কেউই করতে পারছি না। রোদে তরোয়াল ঝলকাচ্ছে, দর্শকদের শ্বাসরুদ্ধ নিস্তব্ধতা ছাপিয়ে ঝন্‌ঝন্‌ ইস্পাতের আওয়াজ। জাদ্‌ দেখলে ও আমার চেয়ে বেশি হাঁপিয়ে উঠেছে; তাই একটা শেষ বেপরোয়া হামলা চালানো দরকার।

সেই মুহূর্তে বিদ্যুতের মতো একটা তীব্র আলোর ঝল্‌কানি আমার চোখ ধাঁধিয়ে দিল। ও এগিয়ে আসছে বুঝতে পেরে আন্দাজেই এক পাশে লাফিয়ে সরে যাই। তবু একটা তীব্র ইস্পাত-ফলার দংশন বেশ টের পাই বাঁ-কাঁধের ওপর। কিন্তু ঠিক তখনই এক পলকের জন্য আমার নজর চলে গিয়েছিল আরেক জায়গায়। দেজা থোরিসের রথের ওপর তিনটে মূর্তি লড়াই দেখছে—দেজা, সোলা আর সারকোজা। দেজা হঠাৎ বাঘিনীর মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল [illegible] এক ঝট্‌কায় সারকোজার হাত থেকে কোনো [illegible] মাটিতে। সূর্যের আলোয় জিনিসটা চক্‌চক্ কর্‌ [illegible] বুঝতে পারলাম লড়াইয়ের চরম সময় কিসের [illegible] আমার চোখে। সারকোজা ভাল ফন্দি এঁ[illegible] আঘাতে মেরে ফেলার।

হাত থেকে ছোট আয়নাটা ফেলে দিতেই রাগে সারকোজার মুখ কালো হয়ে উঠল। কোমর থেকে ছোরা বের করে সে দেজাকে যেই মারতে যাবে, সোলা এক লাফ দিয়ে এসে পড়ল ওদের দু'জনের মাঝখানে। শেষবারের মতো একবার শুধু দেখতে পেলাম সারকোজার বড় ছোরাটা নেমে আসছে সোলার বুকের ওপর।

শত্রু তখন আমার ওপর পূর্ণ উদ্যমে আক্রমণ শুরু করেছে। অথচ কোনো রকমে আক্রমণ ঠেকিয়ে গেলেও আমার মন রয়েছে অন্য দিকে। বার-বার আগুপিছু করতে করতে আচমকা এক সময় আর পাশ কাটাতে পারিনি, জাদের তলোয়ারের তীক্ষ্ণ ফলাটা বেশ টের পেলাম আমার

বুকের মধ্যে বসে যাচ্ছে। আমিও আমার তলোয়ার সোজা উঁচিয়ে শরীরের সমস্ত ওজন ছেড়ে দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লাম ওর ওপর—আমি শুধু একা মরব কেন ?

একটু বাদেই মাথা ঘুরে গেল। চোখে অন্ধকার দেখছি। হাঁটু দুটো যেন শরীরের ভার আর রাখতে পারল না।

বারো

॥ সোলার অদ্ভুত কাহিনী ॥

চেতনা ফিরে আসতেই আমি ফের লাফিয়ে উঠলাম—বোধ হয় এক পলকের জন্য জ্ঞান হারিয়েছিলাম। তলোয়ারখানা খুঁজতে গিয়ে দেখলাম সেটা জাদের সবুজ বুকের ওপর বাঁট অবধি ঢুকে রয়েছে, আর দানবটা পাথরের মতো আড়ষ্ট, মৃত।

পুরো জ্ঞান ফিরে পেতেই বুঝলাম জাদের তলোয়ারের ফলা শুধু আমার বুকের পেশীগুলোই কেটেছে—জখম তেমন মারাত্মক নয়। কুৎসিত পশুদেহটা পেছনে ফেলে যখন শ্রান্ত দেহে নিজের রথের কাছে ফিরে এলাম মঙ্গলবীরেরা আনন্দে তারিফ জানাচ্ছে, কিন্তু আমার গ্রাহ্য নেই কিছুতে। আমার পরিচারিকারা সঙ্গে-সঙ্গেই জখমের চিকিৎসা করতে লেগেছে। এমন সব ওষুধপত্র ওদের জানা আছে যে অতি কঠিন জখমও ওদের কাছে কিছু নয়। আশ্চর্য কাজ করে ওদের ওষুধগুলো। খানিক বাদে রক্তপাতের জন্য দুর্বলতাটুকু ছাড়া আর কোনো যন্ত্রণাই রইল না শরীরে।

আমি আর দেরি না করে ছুটে গেলাম দেজা থোরিসের রথের কাছে। সোলার বুকের ওপর ধাতুর আবরণ থাকায় সারকোজার ছোরা ওর বেশি ক্ষতি করতে পারেনি কিন্তু দেজা উপুড় হয়ে পড়ে আছে রেশম পশমের শয্যার ওপর আর ভয়ানক ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। ও টেরও পায়নি আমি এসেছি আর সোলার সঙ্গে কথা বলছি।

সোলাকে শুধালাম—দেজা বুঝি জখম হয়েছিল ?

—না। তবে ওর ধারণা তুমি মরে গেছ। দেখছ না কেমন কাঁদছে ? আমি তো তোমাদের মানুষ জাতের কিছু বুঝি না, কিন্তু কান্না জিনিসটা আমরা খুব কমই দেখি বারসুমে। অত বড়ো অধিনায়কের নাতনি যখন তোমার জন্য কাঁদছে তখন নিশ্চয় তোমাকে ভালবাসে। বারসুমের সবচেয়ে বড় জাতের মেয়ে সে। নিজেদের মান মর্যাদার খুব জ্ঞান, তবে তারা লোকও ভাল।…কান্না জিনিসটা এর

আগে আমি একবারই দেখেছি—আমার মায়ের কান্না।

—সে কী! তোমার মাকে তো তোমার জানার কথা নয় সোলা?

—আমি জানতাম। বাবাকেও। তুমি যদি সেই অদ্ভুত কাহিনী শুনতে চাও বারসুমের মাটিতে যা কখনো ঘটে না—তাহলে আজ রাতে আমাদের রথে এসো। এসব কথা জীবনেও আমি কারো কাছে প্রকাশ করিনি।...তোমাদের যাত্রার বোধ হয় সময় হল, সংকেত দিয়েছে। এখন তুমি যাও।

—আমি আসছি। কিন্তু দেজাকে বলে দিও আমি বেঁচেই আছি। আমি যে ওকে কাঁদতে দেখেছি সে কথা কিন্তু বোলো না।

টার্স টারকাসের পাশাপাশি চলেছি থোটের পিঠে চড়ে। বিস্তৃত হলদে প্রান্তরের মধ্য দিয়ে আমাদের দীর্ঘ সারবদ্ধ যাত্রা সত্যিই দেখবার মতো। উজ্জ্বল বর্ণাঢ্য আড়াই শো রথ, সামনে থোট-সওয়ার সৈন্য, দু'পাশে পাহারা দিয়ে চলা যোদ্ধাদের সারি। পেছনে সেই অতিকায় 'ঐরাবতগুলো' যাকে ওরা বলে জিতিদার, প্রায় পঞ্চাশটি। জমকালো পোশাক আর ধাতুর আবরণী অলংকার ঝকমক করছে। পৃথিবীতে ভারতের মহারাজারাও বোধ হয় এমন শোভাযাত্রা কল্পনা করতে পারতেন না।...মঙ্গলের শেওলা-ঢাকা প্রান্তরে কিন্তু প্রায় নিঃশব্দ এ শোভাযাত্রা। রথের চওড়া চাকা আর পায়ের চাপে নরম শেওলা বসে যাচ্ছে, আবার সোজা হয়ে উঠছে। না কোনো চিহ্ন, না আওয়াজ।

জায়গাটা হল একটা শুকনো সমুদ্র-মরু। আশপাশে ঘেরা পাহাড়। এখানেই আমরা শিবির করব আজ। জানোয়ারগুলো দুদিন কোনো তরল দুধও পান করেনি, দুমাস তো জলই খায়নি শুনেছি। তবু ওদের কিছু অসুবিধা হয় না। মঙ্গলের ওই শেওলাঘাসের গোড়াতেই নাকি যথেষ্ট রস।...আমি আমার পনীর জাতীয় খাবার আর নিরিমিষ দুধ খেয়ে সোলার খোঁজে চললাম। সে তখন মশাল জ্বালিয়ে কিছু কাজ করছিল। আমাকে দেখে খুশি হয়ে উঠল।

—এসেছ ভালই হল। দেজা থোরিস ঘুমুচ্ছে, আমিও একেবারে

একা। আমার অন্য সঙ্গিনীরা আমার জন্য কখনো ভাবে না, জন কার্টার। আমি তো ওদের মতো নই। ওদের সঙ্গে আমার মেলে না। কী করব, ভাগ্য! ওদের মধ্যেই জীবন কাটাতে হবে আমার। একবার ভাবি আমি যদি খাঁটি সবুজ জাতের মেয়েদের মতো হতাম— কোনো আশা-আকাঙ্ক্ষার ধার না ধেরে, দয়ামায়া শূন্য হয়ে! কিন্তু আমি যে ভালবাসা পেয়েছি জীবনে, আর তা পেয়েও হারিয়েছি।··· তোমাকে আমার কাহিনী শোনাব বলেছিলাম, কাহিনী আসলে আমার মা-বাবার।···

তোমাদের মানুষদের যতোটা বুঝতে পেরেছি, তোমার যা পরিচয় পেয়েছি, তাতে তোমার পক্ষে আজব কিছু মনে হবে না। কিন্তু মঙ্গল-বাসীদের স্মরণকালের মধ্যে এমন ঘটনা কোনোদিন ঘটেনি।···

আমার মা ছিল ছোটখাট প্রাণী, আমাদের মোড়লদের চোখে বিশাল-দেহী যোদ্ধার মা হবার তেমন উপযুক্ত নয়। অন্য সবুজ জাতের মেয়েদের তুলনায় তার স্বভাব ছিল অনেক মিষ্টি আর নরম। মা ওদের পছন্দ করত না বলে কুমারী বয়েসে প্রায়ই একা-একা থাকত, বনে বনে ঘুরে বেড়াত। একবার শহরের পাশের পাহাড়ী জঙ্গলে বুনো ফুল দেখতে দেখতে তার সাক্ষাৎ হল এক তরুণ যোদ্ধার সঙ্গে। যোদ্ধাটির কাজ ছিল থোট আর জিতিদারদের দেখাশোনা করা, যাতে তারা পাহাড়ের ওপারে ডিঙিয়ে না চলে যায়। ওদের আলাপ হল, কথাবার্তা হল। নিজের জাতের প্রাণীদের কুৎসিত নিষ্ঠুর জীবনের ওপর মা'র চরম অভক্তির কথাও মা সোজাসুজি জানাল। কিন্তু যুবকটি এসব কথা শুনে রেগে তো গেলই না বরং তার মনেও এমনি অনেক ভাবনা আছে তা গোপন করল না।···এইভাবে ছ' বছর ধরে ওদের দেখা সাক্ষাৎ চলল, গোপনে বিয়েও হল। আমার মা কাজ করত তাল হাজুসের খাস পরিচারিকাদের দলে। বাবা ছিল সাধারণ যোদ্ধা। ওদের মেলামেশার খবর প্রকাশ হলে থার্কিদের আইনে সাংঘাতিক কড়া শাস্তি হত।···যে ডিমটি থেকে আমি জন্মেছি সেটাকে ওরা থার্ক শহরের পুরনো এক দুর্গের চুড়োয় অতি দুর্গম জায়গা বেছে লুকিয়ে

রেখেছিল। পাঁচ বছর ধরে প্রত্যেকটি বছর মা একবার করে দেখে আসত ডিম। ঘন ঘন যেতে সাহস পেত না পাছে কেউ সন্দেহ করে।··· এই পাঁচ বছরে আমার বাবা যোদ্ধা হিসাবে দারুণ নাম কিনে ফেললেন, বেশ কিছু অধিনায়কের পদ কেড়ে নিলেন। কিন্তু মা'র ওপর তার অনুরাগ একটুও কমেনি। তাঁর একমাত্র ইচ্ছে ছিল তাল হাজুসের পদমর্যাদা কেড়ে নিজের হাতে নেওয়া, যাতে থার্কদের শাসক হিসেবে মা'কে মুক্ত করে আপন করে নিতে পারেন।···

সে এক অসম্ভব স্বপ্ন। কিন্তু পাঁচ বছরের মধ্যে তার উন্নতিও হল প্রচণ্ড। থার্কের সভাসদদের মধ্যে রীতিমতো গণমান্য হলেন। তবু সুযোগ এল না। তাঁকে পাঠানো হল সুদূর দক্ষিণ মেরু অঞ্চলে অভিযানে। দীর্ঘ চার বছর বাদে তিনি যখন ফিরে এলেন তার মধ্যেই অনেক কিছু ঘটে গেছে। বাবার বিদেশ সফরের পরের বছরই সেপাই দল একদিন চলে গিয়েছিল ফুটনাগারে, ডিম থেকে বাচ্চা আনতে। এর মধ্যে ডিম ফুটে আমারও জন্ম হল। মা রোজ রাতে দুর্গের মধ্যে গিয়ে দেখে আসত আমাকে। আর কতো আদর করত—যে আদর আমাদের সমাজ-জীবনে কোনো কালেও মিলতো না, মেলেও না।···

···মা'র আশা ছিল, ফুটনাগার অভিযান থেকে সবুজ যোদ্ধারা ফিরে এলে আমাকে অন্য শিশুদের দলে মিশিয়ে ছেড়ে দেবে তাল হাজুসের অন্দর মহলের মধ্যে, যাতে কেউ বুঝতে না পারে। সবুজ প্রাণীদের প্রাচীন রীতি লঙ্ঘন করার গুরুতর অপরাধ প্রকাশ পেয়ে গেলে তার কপালে যা আছে তা এড়াবার এ ছাড়া আর পন্থা নেই।··· তাড়াতাড়ি কয়েকটা দিনের মধ্যে মা আমাকে ভাষা, সবুজ প্রাণীদের রীতিনীতি আদবকায়দা অনেক কিছুই শিখিয়ে দিল। তারপর একদিন রাতে আমাকে সব কিছু খুলে বললো, মানে আমি তোমাকে এতক্ষণ যা কিছু শুনিয়েছি সবই। যাতে ঘুণাক্ষরেও এসব কথা প্রকাশ না পায় সে বিষয়ে আমাকে বারবার সাবধান করে দিলে মা। আমি যেন কখনো ভুলেও তার প্রতি আমার ভালোবাসা দেখিয়ে না ফেলি কিংবা

মা-বাবার পরিচয় কাউকে দিয়ে না ফেলি। তারপর মা কানে-কানে বলে দিলে আমার বাবার নামটা।...

...আর ঠিক সেই মুহূর্তে অন্ধকার তুর্গের কামরার মধ্যে ডাকিনীর মতো মশাল হাতে উদয় হল সারকোজা। মার দিকে তার সে কী কঠিন ঘৃণার দৃষ্টি! এমন বিদ্রূপ আর গালিগালাজের ঝড় বইয়ে দিলে যে আমি তো ভয়ে আধমরা! সমস্ত কথাই সে শুনে ফেলেছে। কদিন থেকেই সন্দেহ করে সে মা'র পিছু নিয়েছিল, আজ হাতে-নাতে ধরেছে আমাদের।...শুধু একটি কথাই ও শুনতে পায়নি, জানতেও পারেনি, —সে আমার বাবার নাম। তাই সেটা জানবার জন্য বারবার ধমকাচ্ছিল মাকে। কিন্তু হাজার ভয় দেখিয়েও মার মুখ থেকে কিছুতেই বেরুল না কথা। মা বরং আমাকে বাঁচাবার জন্য উলটে মিথ্যেই বলে দিল যে বাবার পরিচয় শুধু সে একাই জানে, জীবনেও তার সন্তানকে সে বলবে না।...শেষে চরম অভিশাপ দিতে-দিতে সারকোজা ছুটল তাল হাজুসের কাছে ব্যাপারটা জানাতে। সেই ফাঁকে আমার মা আমাকে কাঁথা-কম্বলে জড়িয়ে রাস্তায় নেমে ছুটে এল শহরের বাইরে।

...শহরের সীমানায় এসে শুনতে পেলাম বাইরের শেওলা-মাঠ থেকে শহরে ঢোকার রাস্তার ওপর দিয়ে রথ আর জানোয়ারের আওয়াজ আসছে। সেই সঙ্গে একদল ফৌজের অস্ত্রশস্ত্রের ঝন্‌ঝন্ শব্দ। মা ভাবল নিশ্চয় আমার বাবা অভিযান থেকে ফিরে আসছেন সৈন্যসামন্ত নিয়ে। কিন্তু স্বাভাবিক বুদ্ধিতেই ছুটে এগিয়ে দেখতে গেল না। একটা বাড়ির দরজার অন্ধকারে চুপ করে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করতে লাগল। না, এ তো বাবার ফৌজ নয়। চাঁদের আলোয় পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে ছোট-ছোট থার্কি শিশুদের নিয়ে ফিরে আসছে স্ফুটনাগারের অভিযাত্রীরা।...সঙ্গে সঙ্গে মার মাথায় এক বুদ্ধি খেলে গেল। দলের পেছন দিকটা আমাদের কাছ ঘেঁষে এগিয়ে আসতেই মা আমাকে চুমু খেয়ে, ভীষণ রকম আদর করে টুপ্ করে ওদের ভিড়ের মধ্যে মিশে গেল। এর পর তো কোনোদিনও আমাকে বুকে চেপে ধরতে পারব না আর, হয়তো আর তুজনের দেখাই হবে না।

...শহরের চত্বরে ভিড় আর ঠেলাঠেলির মধ্যে আমিও মিশে গেলাম। রক্ষীদের দলের দায়িত্ব শেষ হয়েছে। এখন আমরা শিশুরা সবাই একটি প্রকাণ্ড ঘরে জমা হয়েছি। যে স্ত্রীলোকেরা আমাদের খেতে দেবার যোগাড় করছে তারা কেউ অভিযানে যায়নি। পরদিন সকালে আমাদের দলে দলে ভাগ করে মোড়লদের ঘরে ঘরে পাঠিয়ে দেওয়া হল। কেউ আর আমাকে চিনতেও পারলে না।...সে রাতের পর মাকে আর কখনও দেখিনি। তাল হাজুস তাকে বন্দী করে অকথ্য অত্যাচার করেও মুখ থেকে একটা কথা বের করতে পারেনি। তাল হাজুসের বিকট অট্টহাসির মধ্যে চরম অত্যাচারে তার জীবন শেষ হল। শুনেছি মরার আগে মা ওদের বুঝিয়েছিল, নির্যাতনের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য আমাকেও নাকি সে মেরে ফেলে সাদা গরিলাদের হাতে ছেড়ে দেয়। সারকোজা কিন্তু বিশ্বাস করেনি। এখনো আমাকে সন্দেহের চোখে দেখে। তবে আমার বাবার পরিচয়টাও নিশ্চয় একটু আন্দাজ করে, তাই সাহস পায় না আমাকে ঘাঁটাতে।

...আমার বাবা দক্ষিণ মেরু অভিযান থেকে ফিরে এসে যখন আমার মায়ের শোচনীয় দুর্ভাগ্যের কথা শুনলেন তাল হাজুসেরই মুখে, আমি সেখানে উপস্থিত থেকে দেখেছি ওঁর মুখের একটি পেশী অবধি কেঁপে ওঠেনি, সম্পূর্ণ সংযত রেখেছিলেন নিজেকে। শুধু তাল হাজুসের প্রবল হাসির সঙ্গে তাঁর হাসি মেলেনি, এইটুকুই যা।...সেইদিন থেকে বাবা হয়ে গেলেন প্রচণ্ড নিষ্ঠুর থেকেও নিষ্ঠুরতর। আমি শুধু অপেক্ষা করছি কবে তিনি তাল হাজুসের পশুদেহ নিজের পায়ের তলায় পিষে দাঁড়াবেন! আমি নিশ্চিত জানি, সেই ভয়ংকর প্রতিশোধের মুহূর্তটির জন্য তিনি প্রহর গুণছেন।

—সোলা, তোমার বাবা কি আমাদের মধ্যেই আছেন?

—হ্যাঁ। তবে তিনি জানেন না আমিই তাঁর মেয়ে। আর এও জানেন না কে তাল হাজুসের কাছে বেইমানি করে এসব খবর দিয়েছিল। আমিই শুধু জানি বাবার নাম। আর আমার প্রিয় মায়ের মৃত্যু ডেকে আনতে কে চক্রান্ত করেছিল তা জানে সারকোজা

আর তাল হাজুস, আর জানি আমি।...

কিছুক্ষণ আমরা নির্বাক হয়ে বসে থাকি। সোলা ভাবছে তার ভয়ংকর অতীতের কথা, আর আমি ভাবছি কী হৃদয়হীন অন্ধ চিন্তাহীন এদের সমাজ। একটু পরে সোলা বললে—জন কার্টার, আমি তোমাকে নিশ্চিন্তে বিশ্বাস করতে পারি। একদিন হয়তো তোমার বা দেজা থোরিসের, কিংবা আমার নিজেরই কোনো উপকার হবে, তাই তোমাকে বলব আমার বাবার নামটি। তুমি সময় মতো সাহস করে সত্যি কথাটা প্রকাশও করতে পার।...তাঁর নাম টার্স টারকাস।

তেরো

॥ পালানোর চেষ্টা ॥

থার্ক যাত্রার শেষ কটা দিনে নিরুপদ্রবেই কেটেছে। কুড়ি দিন ধরে আমরা রাস্তায়। দুটো সাগর-মেরু পেরিয়েছি। কোরাদের মতো আরো কটি শহরের ধ্বংসাবশেষ দেখেছি। দু'বার পার হয়েছি মঙ্গলের জলপথ যাকে পৃথিবীর জ্যোতির্বিদরা বলেন, 'মঙ্গলের ক্যানাল'।

এসব জলপথ এলাকা খুব সাবধানে পেরিয়েছি আমরা। সবুজ যোদ্ধারা আগে দূরবীন দিয়ে গোপনে দেখে আসতো, লাল মঙ্গলদের দেখতে না পেলে ফিরে এসে খবর দিলে তবেই রাতের অন্ধকারে জায়গাগুলো পার হতাম। ওদের চষা জমি, বড় বড় রাস্তাগুলো এড়িয়ে চলতাম। চাঁদের আলোয় দেখেছি পাঁচিলঘেরা জমি আর ছোট নিচু বাড়ি—পৃথিবীর খামার-বাড়ির মতোই। একবার একটা মানুষও আমাদের দেখে ঘাবড়ে পালিয়ে গিয়েছিল।

দেজা থোরিসের সঙ্গে এর মধ্যে একবারও দেখা সাক্ষাৎ হয়নি। আমি বারসুম গ্রহে আসার ঠিক তিরিশ দিন পরে আজ ঢুকলাম থার্ক শহরে। বিকেলবেলায় যখন শহরের প্রধান চত্বরে এলাম, তেমন কেউ বড় এল না আমাদের দেখতে। পরে যখন ওদের কানে গেল দু'টি বন্দী এসেছে অভিযাত্রীদের সঙ্গে তখন তারা উৎসুক হয়ে উঠল। দেজা আর আমি ওদের আকর্ষণীয় দ্রষ্টব্য।

বিকেল থেকে সন্ধ্যাটুকু কেটে গেল নিজেদের আস্তানায় উঠে গোছগাছ করে নিতে। আমার বাড়িটা পেয়েছি চত্বরের দক্ষিণে একটা একটা বড় রাস্তার ওপর। গোটা বাড়িই পড়েছে আমার ভাগে। এটাও বিরাট মহল বাড়ি। কোরাদের মতো জাঁকালো শিল্পসজ্জিত সব কামরা। সম্রাটদের যোগ্য আবাস। কিন্তু এই বর্বর প্রাণীগুলোর কাছে এসবের মূল্য নেই, প্রকাণ্ড বড়-বড় কামরা থাকলেই তারা খুশি।

জেডাক তাল হাজুসের বাড়িখানা সবচেয়ে পেল্লায়, কোনো সরকারী

সৌধই হবে। তারপরেই বিরাট প্রাসাদ বাড়িটা লোরকাস্ টোমেলের জন্য রাখা হয়েছে। এমনিভাবে পর পর সব মোড়লদের জন্য বাছা-বাছা অট্টালিকা! যোদ্ধাদের জন্যও তেমনি বাড়ি, শূন্যই রয়েছে সব, যেমন খুশি নিয়ে নাও।

আমি আমার নিজের ব্যবস্থা করে নিয়ে তাড়াতাড়ি বেরুলাম সোলাদের খোঁজে। দেজার সঙ্গে কিছু কথাবার্তা হয়নি, ভাবলাম এবার গিয়ে ওকে বলি কীভাবে তার পালাবার বন্দোবস্ত করা যায়। মনে হচ্ছে এ ক'দিন দেখাসাক্ষাৎ না করায় হয়তো একটু রাগও করেছে।

কিন্তু ওদের আস্তানাই খুঁজে পাই না। এদিকে প্রকাণ্ড লাল সূর্যটা ডুবু-ডুবু। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। তারপর হঠাৎ আমার বাড়ির একই রাস্তায় আরেকটু চত্বরের দিকে এগিয়ে দোতলা এক বাড়ির জানলায় দেখলাম উলার সুশ্রী মাথাটা! কাউকে ডাকাডাকির অপেক্ষা না রেখে ছুটে গেলাম ঘোরানো সিঁড়ির পথে ওপরতলায় উঠে। দরজার সামনে আমায় দেখে উল্লসিত উলা তার প্রকাণ্ড দেহটা নিয়ে যথারীতি ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার কাঁধে। বেচারী এমন খুশি হয়েছে যে মনে হল তার মস্ত হাঁ মেলে আমায় বুঝি গিলেই খাবে!

ছোট্ট ধমক আর একটু আদর দিয়ে ওকে ঠাণ্ডা করে খোঁজ করি দেজা থোরিসের। নাম ধরে ডাকতে অন্য কামরা থেকে একটু সাড়া পেলাম। কাছে গিয়ে দেখি পুরোনো একটা কাঠের পালংকে দেজা গুটি-সুটি বসে আছে। আমি সামনে যেতে উঠে দাঁড়াল। তারপর গম্ভীর গলায় বললে—থার্ক্-নায়ক জন কার্টার কি তার বন্দিনীকে কিছু আদেশ করবেন?

—দেজা থোরিস, তুমি রাগ করেছ। কিন্তু আমি তেমন কিছু করিনি বা বলিনি তো যাতে তুমি মনে আঘাত পাও।···যাহোক সেসব কথা থাক্। তবে তোমার পালাবার ব্যাপারে একটু মিলেমিশে কাজ করার দরকার আছে। তুমি যখন তোমার বাবার দরবারে নিরাপদে পৌঁছুবে তখন না-হয় আমাকে যা মর্জি বোলো। কিন্তু তার আগে পর্যন্ত আমি তোমার প্রভু, আমাকে মেনে চলতে হবে।

মনে হল এবার একটু নরম হয়ে আমার দিকে বেশ কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে দেজা বললে—তোমার কথাগুলো তো ঠিকই বুঝতে পারি, কিন্তু তুমি নিজে যেন কেমন। ছেলেমানুষ না বয়স্ক, পশু না মহৎ, নাকি ছটোরই মেশামিশি! পৃথিবীর মানুষদের মন বোঝা যায় না।

আমি বললাম—মন রয়েছে তোমার কাছেই। কিন্তু তুমি যতক্ষণ সবুজ জীবগুলোর হাতে বন্দী, তোমাকে এ সব কিছু বলব না। শুধু এটুকু জেনে রেখো আমি তোমার জন্য মরতেও রাজি। তুমি নিজের দেশে ভালভাবে পৌঁছে গেলে অনেক সময় পাওয়া যাবে এ সব ভাববার।…

এমন সময় হঠাৎ এসে পড়ল সোলা। একটা অস্বাভাবিক চাঞ্চল্য ওর মধ্যে লক্ষ্য করলাম। বললে—শয়তান সারকোজাটা তাল হাজুসের কাছে গিয়েছিল। চত্বরের আড্ডায় যা শুনলাম তোমাদের দু'জনের কোনো আশা তো দেখছি না।

—কী বলছে ওরা?

—বলছে বাৎসরিক খেলার উৎসবে সবুজ প্রাণীদের পুরো দঙ্গলগুলো ময়দানে হাজির হবে। সেই সময় দেজাকে বুনো ক্যালট্-কুকুরদের সামনে ছুঁড়ে দেওয়া হবে।

আমি বললাম—সোলা, তুমি থার্কি হয়েও ওদের চালচলন রীতিকে আমাদের মতোই ঘেন্না কর। তাহলে তুমি আসবে আমাদের সঙ্গে পালাবার জন্য? আমি নিশ্চিত দেজা থোরিসের ঘরে তোমার জায়গার বা আশ্রয়ের অভাব হবে না। এখানকার চেয়ে বরং ভালই থাকবে সেখানে।

দেজা সঙ্গে-সঙ্গে সায় দিয়ে বললে—তুমিও এসো সোলা! যে স্নেহ মমতা তুমি হারিয়েছ তা হেলিয়ামে এসে আমাদের কাছে নিশ্চয় পাবে।

সোলা খানিকটা নিজের মনেই চাপা গলায় বললে—হেলিয়ামে যাবার সবচেয়ে বড় জলপথটা এখান থেকে মাত্র পঞ্চাশ মাইল দক্ষিণে। ভালো থোট্ পেলে আমরা তিন ঘণ্টায় পৌঁছোতে পারি। তারপর

হেলিয়াম পাঁচশো মাইল, পথে তেমন কোনো বসতি নেই। তবে ওরা জানতে পারবেই এবং জানলেই আমাদের পেছু নেবে। বড়ো বড়ো গাছের আড়ালে কয়েকদিন লুকিয়ে যেতে পারব কিন্তু হেলিয়ামের দরজা পর্যন্ত পৌঁছোবার আগেই আমাদের জীবন দুর্বিষহ করে তুলবে। তোমরা তো জানো না ওদের!

আমি বলি—হেলিয়ামে পৌঁছোবার আর কি কোনো রাস্তা নেই? দেজা, তুমি আমাকে একটা নক্‌শা এঁকে দেখাতে পার?

পাথরের মেঝের ওপর দেজা মানচিত্র এঁকে দেখালে—এই প্রথম দেখলাম বারসুমের এ অঞ্চলের নক্‌শা। অনেকগুলো সরলরেখা কাটাকুটি করে গেছে, কখনো সমান্তরালে, কখনো মিশেছে একটা বৃত্তের মধ্যে। দেজা বললে এই রেখাগুলো জলপথ, বৃত্তগুলো শহর বা জনপদ। একেবারে উত্তর-পশ্চিম কোণের বৃত্তটা হেলিয়াম। কাছে পিঠে যে শহরগুলো আছে তার মধ্যে অনেকগুলোই নাকি আমাদের পক্ষে নিরাপদ হবে না—হেলিয়ামের সঙ্গে সদ্ভাব নেই তাদের।

আমি কিছুক্ষণ ভালোভাবে নক্‌শাটা পরীক্ষা করে একটা জলপথের রেখা বের করলাম—উত্তর দিক থেকে হেলিয়ামের দিকে গেছে মনে হল।

জিজ্ঞেস করি—এটা তোমার ঠাকুরদার এলাকার ভেতর দিয়ে গেছে?

—হ্যাঁ, কিন্তু এখান থেকে দুশো মাইল উত্তরে। তোমার মনে আছে—জলপথটা আমরা থার্কে আসার পথে পার হয়েছিলাম? আমাদের পালাবার সবচাইতে ভাল রাস্তা হবে ওইটেই কারণ অতদূরের পথ আমরা বেছে নেব তা ওদের ধারণারও বাইরে।

সোলাও একমত হল। ঠিক হল আজ রাতেই থার্ক ছেড়ে পালাব, অর্থাৎ আমার থোট্‌-দুটোকে জোগাড় করে জিন লাগিয়ে নিতে যা সময়। সোলা একটাতে চড়বে। আমি আর দেজা আরেকটায়। সঙ্গে দু'দিনের মতো খাবার আর পানীয় নেব আমরা।

শহরের দক্ষিণ সীমার দিকের রাজপথগুলোয় লোকের আনাগোনা

নেই বললেই হয়। সোলাকে বললাম দেজার সঙ্গে সে যেন ওরই একটা ধরে হেঁটে এগিয়ে যেতে থাকে, আমি থোট দুটোকে নিয়ে ওদের আগেই তাড়াতাড়ি চলে যাব। ওরা প্রয়োজন মতো খাবার আর পোশাকের ব্যবস্থা করতে গেল। সেই ফাঁকে আমি চুপিসারে দোতলার পেছন দিয়ে আঙিনায় ঢুকলাম। আমাদের জানোয়ারগুলো ওখানেই ছটফট করে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

খানিকটা চাঁদের আলোয়, খানিক বাড়িগুলোর ছায়ার আঁধারিতে থোট আর জিতিদারগুলো কেবলই গজরাচ্ছে চাপা আওয়াজ তুলে। কাছে পিঠে এতক্ষণ মানুষ বা সবুজপ্রাণীগুলো ছিল না বলে এরা একটু তবু শান্ত আছে। কিন্তু আমার গন্ধ নাকে যেতেই আবার সব চঞ্চল আর উগ্র হয়ে উঠল। এ সময়ে জন্তুদের খোঁয়াড়ে ঢোকার বিপদ আছে তাই সাবধানে ওদের না চটিয়ে কাজ উদ্ধার করতে হবে। আমি তাই সামনে না গিয়ে বাড়িগুলোর ছায়ার আড়াল দিয়ে গুড়ি মেরে চলি। বিপদ দেখলেই দরজার আড়ালে বা জানলা টপকে ভেতরে ঢুকে যাব। আঙিনার পেছনে যেখানে গলির মুখে বড় ফটক, সেখানে গিয়ে নিচু গলায় আমাব থোট দুটোকে নাম ধরে ডাকি।

ভগবানের অশেষ দয়া যে এই বোবা অবোধ প্রাণীগুলোকে আদর আর বন্ধুত্ব দিয়ে বশ করবার মতো বুদ্ধিটুকু আমার হয়েছিল। দেখতে না দেখতে আঙিনার এক কোণ থেকে ঠেলাঠেলি করে ছুটে এল আমার দুই থোট। পাশে এসে আমার গায়ে নাক ঘষে একটু খাবারের টুকরো খোঁজে ওরা। ফটকটা খুলে ওদের হুকুম দিই আগে বেরিয়ে যেতে, তারপর আমিও দরজা ভেজিয়ে দিয়ে ওদের পেছন পেছন এগোই।

ছায়ার ভেতর দিয়ে আমি হেঁটে চললাম যেখানে দেজা আর সোলার সঙ্গে আমার দেখা হবার কথা। প্রেতের মতো নিঃশব্দে এতটা পথ চলে এলাম আমরা, অথচ ওদের পাত্তা নেই। এদিকে শহরের প্রান্তে খোলা মাঠে এসে পড়েছি। আমি একেবারে নিশ্চিত ছিলাম যে ওরা নির্বিঘ্নে এসে পড়বেই। আমারই বরং ছটফটে জানোয়ার দুটোকে নিয়ে ঝামেলায় পড়ার বিপদ ছিল।…এক ঘণ্টা প্রায় কেটে গেল যখন,

একটু দুশ্চিন্তা করতে শুরু করেছি। থোট দুটোকে একটা প্রকাণ্ড বাড়ির দরজার ভেতরে ঢুকিয়ে দিলাম।···

এর পরও আধঘণ্টা কেটে গেল—রীতিমতো উদ্বেগের কথা। হঠাৎ গুটিকয় প্রাণীকে দেখলাম এদিকে এগিয়ে আসতে। এরা আবার কে! অনেকগুলো সেপাই রীতিমতো আওয়াজ করে কথা বলতে-বলতে আসছে। কয়েকটা শব্দ কানে যেতেই মাথা আমার গরম হয়ে গেল! বলছে: নিশ্চয় শহরের বাইরেই মেয়ে দুটোর সঙ্গে মেলার ব্যবস্থা করেছিল, আর তাই এদিকটাতেই মনে হয়···।

কথাগুলো আর শুনবার সময় ছিল না। আমাদের মতলব ধরা পড়ে গেছে···এর পর কি আর পালানো যাবে? ধাঁ করে একটা বুদ্ধি এল মাথায়। এখন যত মুশকিল তো এই অসুর প্রমাণ থোট দুটোকে নিয়ে?

মঙ্গলের এই মান্ধাতা আমলের বাড়িগুলোর গড়ন আমার খানিকটা জানা—সব বাড়িরই মাঝখানে নিচু আঙিনা। ভেতরের অন্ধকার কামরাগুলোর মধ্যে দিয়ে হাতড়াতে হাতড়াতে এগোই আর থোটদুটোকে পেছন থেকে ডাকি। দরজার চৌকাঠ পেরোতে গিয়ে ওদের অসুবিধে হয় বটে কিন্তু সুবিশাল হলঘরগুলোর মধ্যে চলতে বাধা পায় না। যেমন ভেবেছিলাম, মাঝখানে সুন্দর উঠান শেওলাঘাসে ঢাকা। থোটগুলো ওর মধ্যেই আপাতত থাক আর মনের সুখে ঘাস চিবোক, পরে ব্যবস্থা করলেই চলবে। এখানে সবুজ দানবদের আসার কোনো সম্ভাবনা নেই। ওদের লুকিয়ে রেখে আমি ছুটলাম দেজা থোরিসের আস্তানার দিকে। সব বাড়িই পাশাপাশি গায়ে গায়ে ঘেঁষা। তাই যে বাড়িটায় ওরা আছে বলে আন্দাজ করেছি তার পেছনের দোতলার জানলায় অনায়াসেই উঠে পড়ি লাফ মেরে। জানলা দিয়ে কামরার ভেতরে ঢুকে চুপিচুপি সামনের দিকে এগিয়ে আসি। ওর ঘরের দরজার কাছে আসতেই বুঝলাম ভেতরে লোকজন রয়েছে। গলার আওয়াজ পাচ্ছি। কান পেতে শুনি কিন্তু দেজা থোরিসের গলার বদলে পাই শুধু পুরুষদের গলা।

একজন সর্দার নায়ক হুকুম করে বলছে—মেয়েটাকে শহরের ফটকের কাছে না দেখতে পেয়ে নিশ্চয়ই ফিরে আসবে এখানে। সেই মুহূর্তে তোমরা চারজন ঝাঁপিয়ে পড়বে ওর ওপরে, হাতিয়ার কেড়ে নেবে। তারপর আচ্ছা করে বেঁধে প্রধানের বাড়ির নিচের কুঠরিতে নিয়ে এসে শেকল লাগাবে। তাল হাজুসের ডাক পড়লেই যেন হাজির করতে পারি বন্দীকে।…ও মেয়েটার ফিরে আসার ভয় নেই, সে এতক্ষণে দিব্যি আরামে রয়েছে তাল হাজুসের মুঠোর মধ্যে। ওর বাপ-পিতামো চোদ্দপুরুষ কাঁদলেও তাল হাজুসের মন গলবার নয়। সারকোজা বুড়িটা সত্যি-সত্যি কাজের মতো কাজ করেছে একটা।… আমি এখন চললাম। মানুষটা ফিরে এলে যদি বন্দী না করতে পার, তোমাদের ধড় কেটে ইস্ নদীর ঠাণ্ডা জলে ভাসিয়ে দেব।

চোদ্দ

॥ নরকপুরী থেকে নতুন পাঁকে ॥

যা শুনলাম তারপর আর সেখানে এক মুহূর্ত দাঁড়াইনি। আতঙ্কে মন শিউরে উঠেছে। যে রাস্তায় ভেতরে ঢুকেছিলাম, একই পথে সন্তর্পণে বাইরে বেরিয়ে এলাম।

এখন যা করার তা আমি এর মধ্যেই ঠিক করে ফেলেছি। চত্বর পেরিয়ে রাজপথের কিনারা ঘেঁষে উলটো দিকের আঙিনাটার মধ্যে ঢুকলাম। এটাই তাল হাজুসের নরকপুরী। একতলার পেছনের ঘরগুলোতে উজ্জ্বল আলো জ্বলছে। ভেতরে উঁকি মেরে বুঝলাম এপথে ঢোকা সহজ হবে না। সব ঘরেই সবুজ যোদ্ধা আর পরিচারিকাদের ভিড়।

ওপরের তেতলার ঘরগুলোতে বরং আলো নেই। ঢুকলে ওখান দিয়েই ঢুকতে হবে। আমার পক্ষে মোটেই শক্ত কাজ নয়। মিনিট খানেক বাদে তেতলার অন্ধকার ঘরের ছায়ায় গা ঢেকে এগিয়ে গেলাম ভেতরের গলিবারান্দার দিকে। পথটা সোজা গিয়ে যেখানে উঠেছে, দেখতে পেলাম প্রচুর আলো আর লোকজনের আওয়াজ। এগিয়ে গিয়ে ব্যাপারটা বুঝলাম, আসলে তেতলার এই করিডরের মুখে বিশাল হলকামরা যেটা নিচের তলা থেকে উঠেছে একেবারে ওপরের ছাতের গোলগম্বুজ অবধি।···আড়াল থেকে নিচে তাকিয়ে দেখি বৃত্তাকার সভাকক্ষের অঙ্গনে ভিড় করে আছে নায়ক, যোদ্ধা, স্ত্রীলোক। এক প্রান্তে মস্ত উঁচু মঞ্চের ওপর একটি অতি কুৎসিত প্রাণী আসনপিঁড়ি হয়ে বসে আছে। সবুজ জাতের দানবদের হিংস্র ভয়ংকর চেহারার সবটুকুই এর আছে, তার ওপরেও যেন জঘন্য একধরনের পাশবিক কুটিলতার ছাপ—বহু বছরের ক্রমাগত অনাচারের ফল। এতটুকু মর্যাদাবোধের চিহ্ন নেই। প্রকাণ্ড স্থূল বপুটা যেভাবে আসনে ছড়িয়ে বসেছে দেখলে একটা অতিকায় শয়তান ছ'পেয়ে ব্যাঙ ছাড়া কিছু মনে হয় না।

কিন্তু এর চেয়েও ভয়ানক দৃশ্য হল প্রাণীটার কুৎকুতে ছুটো রাক্ষস চোখের সামনে দাঁড়িয়ে দেজা থোরিস আর সোলা। চোখ ছুটো যেন গিলছে ওদের। দেজা যেন কিছু বলছে যা আমি এতদূর থেকে শুনতে পাচ্ছি না, তবে ওর বিদ্রূপের ভ্রূকুটি এখান থেকেও দেখতে পাচ্ছি। দেজার চেহারায় যেন অদ্ভুত এক তেজস্বিতা ফুটে উঠেছে, যা রাজকন্যারই উপযুক্ত। ওর ছোট পাতলা শরীরের মর্যাদাব্যঞ্জক ভঙ্গীর পাশে লম্বা যোদ্ধাগুলোকে যেন নেহাতই বেকুব বামন মনে হচ্ছে।

অধৈর্যভাবে ইশারা করে তাল হাজুস্ এবার সবাইকে কক্ষের বাইরে চলে যেতে হুকুম দিলে। বন্দীদের ছেড়ে দিয়ে রক্ষীরা, সৈন্যসামন্ত পরিচারিকারা ধীরে ধীরে অদৃশ্য হল। শুধু দেজা আর সোলা রইল থার্ক জেডাকের সামনে।

আমি দেখতে পাচ্ছিলাম, শুধু একজন অধিনায়ক একটু ইতস্তত করছে বেরিয়ে যেতে। একটা প্রকাণ্ড থামের আড়ালে ছায়ার অন্ধকারে সে দাঁড়িয়ে আছে তার মোটা তরোয়ালের বাঁটখানা হাতের মুঠোয় চেপে। চোখে যেন প্রতিহিংসার আগুন। টার্স টারকাস! আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছিলাম তার মনের কথা। মুখের ওপর ঘৃণার ভাব চাপা থাকেনি। বোধহয় চল্লিশ বছর আগের সেই মেয়েটির স্মৃতি, এই ভাবেই সেদিন সেও বোধহয় দাঁড়িয়েছিল শয়তানটার সামনে। এই মুহূর্তে আমি যদি ওর কানে কানে বলতে পারতাম একটা কথা, তাহলে তাল হাজুসের রাজত্ব খতম হয়ে যেত।...

একটু বাদে সেও বেরিয়ে গেল কক্ষ ছেড়ে—জানতেও পারল না যে তারই রক্তের সন্তান মেয়েটিকে একা ছেড়ে গেল ঘৃণ্য পশুটার দয়ার ওপর ভরসা করে।

তাল হাজুস উঠে দাঁড়িয়েছে। আমিও সঙ্গে-সঙ্গে ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে ছুটে গেলাম নিচের তলায়। বাধা দেবার কেউ ছিল না। নজর এড়িয়ে সভাকক্ষের আঙিনায় ঢুকে সেই থামটার আড়ালেই লুকিয়ে রইলাম যেখানে একটু আগেই দাঁড়িয়েছিল টার্স টারকাস। তাল

হাজুস কিছু বলছে।

—দেখ হেলিয়ামের রাজকুমারী! তোমাকে যদি এমনিই খালাস করে ফিরিয়ে দিতাম নিজের রাজ্যে, তাহলে বেশ কিছু মোটা পণও বাগিয়ে নিতে পারতাম শক্ত হাতে। কিন্তু তার চেয়ে আমার অনেক বেশি কাম্য তোমার সুন্দর চাঁদ মুখটা কেমন অত্যাচারে বিকৃত হয়ে ওঠে তাই দেখা। এবং অত্যাচারটা দীর্ঘ সময় নিয়ে করা যাবে, তা আমি এখুনি বলে রাখছি।···তোমার জাতের ওপর আমার যা 'গভীর ভালবাসা' তা প্রকাশ করতে মাত্র দশ দিনের মজা তো কিছুই নয়। যুগ যুগ ধরে লাল মানুষরা তোমার ভয়ানক মৃত্যুর কথা মনে করে শিউরে উঠবে—তাদের চোখের ঘুম উপে যাবে সবুজ দানবদের প্রতি-[illegible]তনে, তাল হাজুসের ক্ষমতা আর নিষ্ঠুর হিংসার পুরো স্বাদ পেয়ে যাবে তারা। আগামী কাল থেকেই শুরু হবে এই নির্যাতনের খেলা।···

বলতে বলতে মঞ্চ থেকে লাফ দিয়ে নেমে তাল হাজুস্ দেজার হাতের কব্জি সজোরে চেপে ধরে। কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গেই আমি ঝাঁপিয়ে পড়ি দুজনের মাঝখানে। ডান-হাতে আমার ছোট ভোজালিখানা। কিছু বুঝে ওঠার আগেই আমি তাল হাজুসের হৃৎপিণ্ডটা ফুঁড়ে দিতে পারতাম। কিন্তু মনে পড়ল টার্স টারকাসের কথা, তাই চরম রাগ আর ঘৃণার মধ্যেও ইচ্ছে করল না তাকে বঞ্চিত করতে—এত দীর্ঘ বছরগুলো ধরে সেই তো অপেক্ষা করছে এমন একটি সুন্দর মুহূর্তের জন্য। চরম প্রতিশোধটা তার জন্যই তোলা থাক্।

এক প্রচণ্ড ঘুষি বসিয়ে দিলাম জানোয়ারটার চোয়াল লক্ষ্য করে। নিঃশব্দে মড়ার মতো সে এলিয়ে পড়ল মেঝের ওপর।

তেমনি নীরবতার মধ্যেই দেজা থোরিসের হাত ধরে, ইশারায় সোলাকে সঙ্গে আসতে বলে, আমি সভাকক্ষের পেছনের সেই সিঁড়িটা দিয়ে আবার চলে এলাম উপরতলায়। তারপর সকলের অলক্ষ্যে পেছনের দিকের জানলায় এসে আমার চামড়ার বেল্ট্ আর বন্ধনীগুলোর সাহায্যে দেজা আর সোলাকে নিচে নামিয়ে দিলাম। নিঃশব্দে মাটিতে

লাফিয়ে পড়ে ওদের টেনে নিয়ে চললাম যে-পথে আগে এসেছিলাম সেই পথ ধরে। ছায়ার মধ্যে গা ঢাকা দিয়ে তাড়াতাড়ি এসে পড়লাম সেই বাড়িটার আঙিনায় যেখানে থোটগুলোকে ছেড়ে গিয়েছি। জিনসাজ আর চামড়ার ফিতে ঠিক করে বেঁধে ওগুলোকে আগের মতোই দাবড়ে নিয়ে গেলাম গলির রাস্তায়। সোলাকে চড়িয়ে দিলাম একটা থোটের পিঠে। আমি আর দেজা উঠলাম দ্বিতীয়টার ওপর। থার্ক-শহরের দক্ষিণে এসে জলপথ ধরবার সহজ রাস্তাটা ছেড়ে উত্তর-পুবের সেই দীর্ঘ দুশো মাইলের রাস্তাই ধরলাম ইচ্ছে করে। দুর্গম শেওলা ভরা এবং বিপজ্জনক হলেও ওদের ধোঁকা দেওয়া যাবে।

শহর ছেড়ে অনেকটা দূরে চলে এসেছি অথচ একটি কথাও বলিনি নিজেদের মধ্যে। একবার শুধু পেছন থেকে দেজা বলেছিল—জন কার্টার, আমরা যদি পালিয়ে বাঁচতে পারি, হেলিয়াম তোমার ঋণ জীবনেও শুধতে পারবে কিনা সন্দেহ। না বাঁচলেও ক্ষতি নেই, কারণ মৃত্যুর চেয়েও জঘন্য জীবন থেকে তো মুক্তি দিয়েছ আমায়।

আমি কোনো জবাব দিই নি।···গোড়ার দিকে আমাদের যা পরিকল্পনা ছিল তা দুর্ভাগ্যক্রমে উল্‌টে গেল। সঙ্গে খাবার পানীয় কিছুই নেই। অস্ত্র যা আছে সে শুধু আমারই। থোট দুটোকে বাধ্য হয়ে জোরে ছোটাতে হচ্ছে যাত্রার প্রথম ধাপটুকু অন্তত তাড়াতাড়ি শেষ করতে। সারারাত ধরে ছোটার পর আবার পুরো একটা দিন। পথে মাত্র দু'বার মামুলি বিশ্রাম নিয়েছি। দ্বিতীয় রাতে আমরাও যেমন ক্লান্ত, থোট দুটোও যেন দাঁড়াতে পারছে না—তাই শেওলার ওপর শুয়ে পাঁচ-ছ ঘণ্টা ঘুমিয়ে নিলাম। ভোরবেলায় উঠে ফের যাত্রা শুরু করে সারাটা দিন চলার পরও দূর থেকে একখানা গাছও নজরে পড়ল না। জলপথের চিহ্ন ওই গাছগুলোই। অবশেষে কঠিন সত্যটা আচম্‌কা উপলব্ধি করলাম—আমরা পথ হারিয়েছি!

একটা চক্রের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছি। দিনের সূর্য বা রাতের তারা দেখেও হদিশ পাওয়া যাচ্ছে না কোন্‌দিকে চলেছি। জলপথের দেখা নেই। শেষে কি ক্ষুধাতৃষ্ণা আর ক্লান্তিতেই মৃত্যু ঘনাবে আমাদের?

দূর থেকে একটা নিচু পাহাড়ের রেখা দেখা যাচ্ছে। ওটার কাছে কোনো রকমে পৌঁছুতে পারলে হয়তো ওপর থেকে জলপথের চিহ্ন দেখতে পাব। যখন পৌঁছোলাম রাত হয়ে গেছে, অগত্যা ঘুমিয়ে পড়া ছাড়া কিছু করার রইল না। ভোরবেলায় ঘুম ভাঙতেই টের পেলাম আমার গায়ের ওপর কারুর প্রকাণ্ড দেহ ঠেস্ দিয়ে আছে। চমকে তাকিয়ে দেখি আমার উলা! গায়ে গা ঘেঁষে ঘুমোচ্ছে। বিশ্বাসী জানোয়ারটা এতটা দূর পথ পেছু-পেছু এসেছে আমাদের দুর্ভাগ্যের ভাগ নিতে। দু'হাতে বেচারির গলা জড়িয়ে গালে গাল ঘষে দিই। বলতে লজ্জা নেই আমার জন্য ওর দরদ দেখে চোখের জল ঠেকাতে পারিনি।

দেজা আর সোলা জেগে উঠতেই আর দেরি না করে পাহাড়ের দিকে এগোতে শুরু করলাম। বেশি দূর যেতে পারিনি, এর মধ্যে আমাদের থোটটা আর চলতে না পেরে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল। পড়বার সময় আমি আর দেজাও ধরাশায়ী। আমাদের তেমন কিছু হয়নি কিন্তু থোটটার অবস্থা তখন অতি করুণ, উঠে দাঁড়াতে পারছে না।

অগত্যা দেজাকে অন্য থোটটার ওপর বসিয়ে সোলা চলল আমার সঙ্গে হেঁটে। একটু পথ এইভাবে চলবার পর দেজা হঠাৎ উত্তেজিত কণ্ঠে বলল সে একদল থোট-সওয়ার যোদ্ধাকে দেখতে পাচ্ছে! তারা একটা পাহাড়ি রাস্তা ধরে সার বেঁধে নেমে আসছে। বেশ কয়েক মাইল দূরে। আমি আর সোলাও এবার দেখতে পেলাম কয়েক'শো সেপাই। কিন্তু তারা আমাদের দিক থেকে বরং দূরেই সরে যাচ্ছে। নিশ্চয় ওরা থার্কের যোদ্ধা, আমাদের খোঁজেই বেরিয়েছিল। দেজাকে থোটের পিঠ থেকে নামিয়ে দিয়ে জানোয়ারটাকে শুয়ে পড়তে বললাম। আমরা তিনজনও গুটিসুটি হয়ে মাথা গুঁজে থাকলাম যাতে সৈন্যগুলোর নজরে না পড়ি। ভাগ্যক্রমে একটা টিলার আড়ালে ওরা অদৃশ্য হয়ে গেল এবার।

কিন্তু একটু পরেই দলের শেষ সৈন্যটা একা বেরিয়ে এল পাহাড়ি রাস্তায়। হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে একটা দূরবীন চোখে লাগিয়ে সে চারদিকটা নজর বুলিয়ে দেখতে লাগল। এ নিশ্চয় ফৌজী দলটার

নায়ক, ইচ্ছে করেই দলের পেছনে রয়েছে। দূরবীনটা ক্রমে ঘুরে আসছে আমাদের দিকে। আমি তো ঘামতে শুরু করেছি। তারপর তার লক্ষ্য স্থির হয়ে দাঁড়াল সোজাসুজি আমাদের মুখের ওপর। উদ্বেগে আমাদের স্নায়ু ছিঁড়ে যাচ্ছে তখন। দূরবীন নামিয়ে সে চিৎকার করে কিছু হুকুম করলে টিলার আড়ালে অদৃশ্য যোদ্ধাগুলোকে উদ্দেশ করে। ওদের আসার অপেক্ষা না করেই সর্দার নিজে থোট ঘুরিয়ে তীর বেগে ছুটে আসতে লাগল আমাদের দিকে।

আমার সামনে তখন একটাই শেষ সুযোগ। কাঁধের ওপর মঙ্গলের সেই আজব রাইফেলখানা তুলে ভাল করে তাক্ করে টিপে দিলাম ট্রিগারের বোতাম। একটা তীব্র আওয়াজের সঙ্গে-সঙ্গে মারমুখো মূর্তিটা চিৎ হয়ে উল্‌টে গেল বাহনটির পিঠ থেকে।

লাফিয়ে উঠে থোটটাকে ঠেলে দাঁড় করলাম। সোলাকে বললাম দেজাকে সঙ্গে নিয়ে যত তাড়াতাড়ি পারে ছুটে যাক পাহাড়টার দিকে, সবুজ যোদ্ধারা এসে পড়বার আগেই। পাহাড়ের খাতে বা আনাচে-কানাচে ওদের আপাতত লুকিয়ে থাকতে অসুবিধা হবে না—থার্ক দানবদের হাতে পড়ার চেয়ে বরং সেখানে যদি অনাহারে তৃষ্ণায় মরেও যায় তবু ভাল! আমার দুটো রিভলবারই জোর করে ওদের হাতে গুঁজে দিলাম আত্মরক্ষার জন্য। দেজাকে তুলে বসিয়ে দিলাম থোটের পিঠে সোলার পেছনে।

চাপা গলায় বললাম—বিদায় রাজকুমারী। হয়তো হেলিয়ামে আবার দেখা হবে। এর চেয়েও কঠিন বিপদে আমি বহুবার পড়েছি—ঘাবড়িও না।

—সে কী! তুমি আসছ না?

—না। এদের কিছুটা সময় তো ঠেকিয়ে রাখতে হবে।

আর বাক্যব্যয় না করে থোটের পেছনে এক চাপড় মেরে হাঁকিয়ে দিলাম। ওরা রওনা হয়ে গেল।

পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখি বাকি সেপাইগুলো বেরিয়ে এসে ওদের সর্দারকে খুঁজছে। মৃতদেহটা দেখতে পেয়েছে। তারপর আমাকেও।

শেওলা ঘাসের ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে আমি রাইফেল চালাতে শুরু করি। রাইফেলের ম্যাগাজিনে রয়েছে একশো গুলি, পিঠের বেল্‌টেও একশো। তাই এক নাগাড়ে চালিয়ে যাই গুলি। প্রথম খেপে প্রায় সব যোদ্ধাই হয় সাবাড় হয়েছে, নয় পালিয়ে গেছে। কিন্তু পরে আরো হাজার জনের নতুন দল ছুটে এল উন্মাদের মতো। শেষে রাইফেলের গুলি গেল ফুরিয়ে, ওরাও এসে পড়েছে আমার ঘাড়ের ওপর। এক ঝলক দেখে নিয়ে বুঝলাম দেজা আর সোলা পাহাড়ের আড়ালে অদৃশ্য হয়েছে। আমি রাইফেলটা ফেলে দিয়ে লাফিয়ে উঠে ছুটলাম দেজা-সোলাদের উল্টো মুখে। সেদিন মঙ্গলের প্রাণীগুলো আশ্চর্য হয়ে দেখেছিল আমার অদ্ভুত লাফের কায়দা। কিন্তু আমার ছলনায় ভুলে দেজা-সোলার দিকে ওদের নজর না গেলেও আমার পেছু ছাড়েনি। হন্যে হয়ে আমাকে তাড়া করেছে। অবশেষে একটা পাথরের কোণায় চোট্ লেগে আমি পড়ে গেলাম শেওলাঘাসের ওপর হাত-পা ছড়িয়ে। শেষ অবধি ছোরা বের করে ওদের হামড়ে-পরা দেহ জখম করার চেষ্টা করেও আর পারলাম না।

ঝড়ের মতো কিল-ঘুষি বৃষ্টি হচ্ছিল আমার ওপর। মাথা ঘুরতে লাগল, চারদিক অন্ধকার দেখলাম। তারপর কিছু আর জানি না।···

পনেরো

॥ বারহুনদের বন্দী ॥

নিশ্চয় বেশ কয়েক ঘণ্টা অজ্ঞান হয়ে পড়ে ছিলাম। জ্ঞান ফিরে আসার পর কিছুক্ষণ বুঝতেই পারিনি বেঁচে আছি কি মরে গেছি।

একগাদা রেশম আর পশম শয্যার মধ্যে ঘরের এক কোণে শুয়ে আছি। ছোট ঘরটার মধ্যে অনেকগুলো সবুজ জাতের সেপাই। আমার মুখের ওপর ঝুঁকে রয়েছে একটা সবুজ জাতের কুদর্শনা বুড়ি।

আমি চোখ খুলতেই বুড়িটা সেপাইদের একজনের দিকে তাকিয়ে বললে—মোড়ল, এ তো বেঁচে যাবে!

সবুজ দানবটা আমার বিছানার দিকে এগিয়ে এসে বললে-- ভালো কথা। বড়ো খেলার ময়দানে এর খেলা খুব জমবে!

ভালো করে চেয়ে দেখি এ প্রাণীটা তো থার্কের দানব নয়। এর অলংকার যুদ্ধসাজ ও-জাতের নয়। বিরাট দশাসই চেহারা, মুখ আর বুকের ওপর ভয়ানক জখমের চিহ্ন। একটা গজদন্ত ভাঙা, একটি কান কাটা। গলায় মড়ার খুলি আর শুকনো মড়ার হাতের মালা ঝুলছে।

বুঝলাম এবার এক নতুন বিপদে পড়েছি।

বুড়ির কাছে দানবটা যখন শুনলে আমি এখন পথ চলার উপযুক্ত, সে আমাদের সবাইকে হুকুম দিলে তৈরি হয়ে মূল সৈন্যসারির পেছনে রওনা হতে। একটা দুর্দান্ত থোটের পিঠে ওরা আমায় আষ্টে-পৃষ্ঠে বেঁধে দিয়েছে। আমার আর কোনো যন্ত্রণা নেই—এমনই আশ্চর্য এদের ওষুধগুলো। আর তেমনি সুন্দর করে বেঁধে প্লাস্টার করেছে জখমগুলো। তীর বেগে ছুটে চলেছি আমরা।

সন্ধ্যা নাগাদ মূল সৈন্যদলটাকে যখন আমরা ধরে ফেলেছি দেখলাম তারা এখানেই রাতের মতো শিবির করে বসেছে। আমরা পৌঁছোনো মাত্রই আমাকে ওরা হাজির করল ওদের দলপতির সামনে। বারহুনদের সেই নাকি প্রধান নায়ক। এ দানবটার দেহও অসংখ্য জখমের দাগে

ভরা। এরও গলায় মড়ার খুলির মালা ঝুলছে—বারহুনদের দলনেতাদের এই বোধহয় বীরসজ্জা। কথাবার্তার মধ্যেই বুঝলাম দাক্ কোভা নামের সেই দলপতিটা যে আমায় ধরে নিয়ে এসেছে, তার সঙ্গে এই প্রধান নায়ক বার কোমাসের ভীষণ রেষারেষি। বার কোমাসের বয়েসটা একটু কম। ইচ্ছে করেই বুড়ো দাক্ কোভা তার নেতাকে অসম্মান করে কথা বলছে দেখতে পাচ্ছিলাম।

ওদের স্বাভাবিক অভিবাদনের ধার না ধেরেই দাক্ কোভা আমাকে ঠেলে এগিয়ে দিল প্রধান নায়কের সামনে। গলা চড়িয়ে বললে—থার্কের সাজপরা এই আজব জন্তুটাকে ধরে এনেছি, আমার ইচ্ছে খেলার ময়দানে বুনো থোটের সঙ্গে এর লড়াই দেখব।

গম্ভীরভাবে তরুণ শাসকটি জবাব দিলে—তোমার নায়ক বার কোমাস্ স্বয়ং ওর উপযুক্ত মৃত্যুর ব্যবস্থা করবে, অবশ্য যদি তার প্রয়োজন থাকে।

—যদি প্রয়োজন থাকে মানে? খেঁকিয়ে উঠল দাক্ কোভা—আমার গলার মুণ্ডমালার দিব্যি, মরতে একে হবেই। বার কোমাস্, তোমার ন্যাকা দরদ রাখো। বারহুনে কি খাঁটি নায়কের অভাব হল যে একটা কাপুরুষের রাজত্ব মেনে নিতে হবে? বুড়ো দাক্ কোভা তোমার নেতার সাজ খালি হাতে টেনে নিতে পারে! বার কোমাসের চোখে মুহূর্তের জন্য ফুটে উঠেছিল তীব্র বিদ্বেষের চাউনি। তারপরেই সে হাত বাড়িয়ে সোজা দাক্ কোভার গলা লক্ষ্য করে ঝাঁপিয়ে পড়ল। কোনো অস্ত্রও সে ধরেনি।

শুধু খালি হাতে প্রকৃতির পশুদের মতো এমন ভয়ংকর লড়াই মঙ্গলবাসীদের মধ্যে আগে কখনো দেখিনি। নখের আঘাতে পরস্পরের চোখ আর কান ছিঁড়ে ফেলে অবশেষে গজদন্ত বসিয়ে কামড়াকামড়ি। পা থেকে মাথা অবধি দুজনেরই কেটে ছিঁড়ে খুড়ে রক্তাক্ত হয়ে উঠল। প্রথম-প্রথম বার কোমাস্ই প্রতিদ্বন্দ্বীকে বেশি নাজেহাল করলেও শেষ অবধি দাক্ কোভা তাকে মাটিতে আছড়ে ফেলে দাঁত দিয়ে তলপেট কামড়ে ধরে সাংঘাতিকভাবে তার গোটা দেহটাই চিরে ফেলে দিলে।

বার কোমাসের মৃত্যু হল। দাক্ কোভাও শোচনীয়ভাবে জখম, তবে তার পরিচারিকারা তিন দিন ধরে অক্লান্ত পরিশ্রমে চিকিৎসা করে বাঁচালো তাকে। তিন দিন পর সে বার কোমাসের মৃতদেহের কাছে এসে যুদ্ধসাজ আর হাতিয়ারগুলো খুলে নিল। পরাজিত শত্রুর মাথা আর হাত কেটে নিজের গলায় ঝোলালো আর তার ধড়ের ওপর পা রেখে নিজেকে ঘোষণা করল বারহুনদের নতুন নেতা হিসাবে।

দশ হাজার যোদ্ধার দল নিয়ে এরা একটা অভিযানে বেরিয়েছিল। ক'দিন আগে থার্কের সবুজ জাতের প্রাণীরা এদের স্ফুটনাগারের ডিম নষ্ট করেছিল। তার শোধ তুলতে এরা একটা ছোট থার্কি গ্রামের ওপর হামলা করবে এই ছিল অভিযানের উদ্দেশ্য। যা হোক, ঝগড়াঝাঁটির ফলে আপাতত অভিযান স্থগিত রেখে সবাই ফিরে চলল বারহুনের দিকে।

বারহুনের এই জাতটা ভয়ানক নিষ্ঠুর, রক্তপিপাসু। এমন দিন যায় না যেদিন বারহুনের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে হিংস্র লড়াই না চলে। একদিনের মধ্যে আটটা মারাত্মক দ্বন্দ্বযুদ্ধও দেখেছি।...আমাকে বারহুনে এনেই এরা কারাগারে নিক্ষেপ করলে। পাতালের কারা কুঠরি। দেয়াল আর মেঝের আংটার সঙ্গে শেকল বাঁধা পড়ে রইলাম। মাঝে মাঝে খাবার দেয় বটে, কিন্তু ভেতরে এমন নিকষ কালো অন্ধকার যে টেরও পাইনি দিন বা রাত।...

জীবনের এক জঘন্য অভিজ্ঞতা হল। ঘোর আঁধারে অদ্ভুত সব জানোয়ার শরীরের উপর দিয়ে সড়সড় করে হেঁটে যায়। শুয়ে থাকলে তাদের ঠাণ্ডা হিলবিলে দেহের ছোঁয়া টের পাই। মাঝে মাঝে একেক জোড়া জ্বলন্ত চোখও দেখি একদৃষ্টে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে অন্ধকারে।...এর ওপর ভয়ানক নৈঃশব্দ্য, কোনো আওয়াজই এখানে এসে পৌঁছোয় না। এমনকি যে রক্ষীটা খাবার নিয়ে আসে তারও মুখে কথাটি নেই। প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে তাকে হয়রান করে তুলি, তবুও সাড়া দেয় না। রাগে-ঘেন্নায় বারহুন জাতটার ওপর আমার এমন আক্রোশ এসে যায় মনে হয় প্রত্যেকটা প্রাণীকে নির্মম হাতে দলে পিষে মারি।...

রোজই রক্ষীটা খাবার দেবার সময় লক্ষ্য করেছি আমার বুক অবধি মাথাটা নিচু করে মাটিতে থালা রাখে। সে সময় আমার দিকে তার নজর থাকে না। একদিন ধূর্ত পাগলের মতো কুঠরির কোণের দিকে গুটিসুটি মেরে বসে আছি। যেই লোকটার আওয়াজ পেয়েছি অমনি আমার শেকলের একটা কড়া হাতের মধ্যে রেখে সবুর করতে লাগলাম। লোকটা মাথা নিচু করতেই ওর মাথার খুলির পেছনে সজোরে কষিয়ে দিলাম ভারি কড়ার ঘা। নিঃশব্দে মেঝের ওপর গড়িয়ে পড়ল ওর মৃতদেহ।...

উন্মাদের মতো একবার সশব্দে হেসে আমি মৃতদেহটা হাতড়াতে শুরু করি চাবির গোছার সন্ধানে। চাবির শেকলটা খুলে নেবার চেষ্টা করছি হঠাৎ নজরে পড়ল ছ'জোড়া জ্বলন্ত চোখ আমার দিকে স্থির অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে অন্ধকারের মধ্যে।

ক্রমেই চোখগুলো এগিয়ে আসতে লাগল আর আতঙ্কে আড়ষ্ট হয়ে পেছিয়ে যেতে লাগলাম আমি। কোণের দিকে গুঁড়িসুড়ি মেরে হাতের মুঠো দুটো সামনে বাগিয়ে রইলাম। চোখগুলো সর্পিল গতিতে ধীরে ধীরে আমার পায়ের কাছে মৃতদেহটার ওপর এগিয়ে এল। তারপর আবার আস্তে আস্তে ফিরে যেতে লাগল একটা অদ্ভুত খর খর আওয়াজ করে। শেষে আমার কারাকুঠরির ঘন অন্ধকার কোণের দিকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বগলের তলায় তলোয়ারটা চেপে দড়াম্ করে মাটিতে পড়ে গেলাম ...
কাস্টোস্ আমার কৌশলটা ঠিকই বুঝতে পেরেছে। ... পৃ.৮৭

ষোলো

॥ লড়াইয়ের মাঠে ॥

নিজেকে একটু সামলে নিয়ে ফের এগুলাম মৃতদেহটার দিকে,—চাবির গোছা উদ্ধার করতে। কিন্তু অন্ধকারে হাতড়ে দেখি আশ্চর্য! দেহটা যে উধাও হয়েছে।

এক ঝলকে বুঝতে পারলাম ঘটনাটা। জ্বলন্ত চোখের সেই বীভৎস জীবগুলো আমার শিকারটিকে চুরি করে নিয়ে ঢুকেছে তাদের গোপন বাসায়, সেখানেই বসে গ্রাস করবে লাশটাকে! বোধহয় আমার দেহটার জন্যও তারা এমনি দিনের পর দিন তাক করে আছে—প্রাণটুকু বেরিয়ে গেলেই আমার মৃতদেহে হবে ওদের উদরপূর্তি!

দুদিন আর কেউ আসেনি আমার খাবার নিয়ে। তারপর একটি নতুন রক্ষী এল সঙ্গে আরেকজন বন্দীকে নিয়ে। তাকেও আমার পাশেই শেকলে বাঁধা হল। মশালের ক্ষীণ আলোয় দেখলাম বন্দীর চেহারা। এ যে মঙ্গলের লাল-জাতের মানুষ। আমার আর তর সইছিল না। রক্ষীটা চলে যেতেই আমি বারসুমের ভাষায় তাকে নমস্কার জানালাম—কেওর!

—অন্ধকারে কে কথা বলছ?

—জন কার্টার। হেলিয়ামের লাল মানুষদের বন্ধু।

—আমিও হেলিয়ামের, কিন্তু তোমার নাম তো কখনো শুনিনি।

এবার তাকে সব কথাই খুলে বললাম, মানে এখন পর্যন্ত যা কিছু ঘটেছে আমার জীবনে। শুধু দেজা থোরিসের ওপর আমার বিশেষ প্রীতির কথাটুকু উল্লেখ করিনি। হেলিয়ামের রাজকুমারীর সংবাদ পেয়ে সে ভীষণ চঞ্চল হয়ে উঠেছে। তার পরিষ্কার ধারণা দেজা আর সোলাকে আমি যেখানে ছেড়ে এসেছি সেখান থেকে ওরা অনায়াসেই নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে যাবে। বারহুনরা যে পাগাড়ি রাস্তা দিয়ে বেরিয়ে এসেছিল, ওই রাস্তাই লাল মানুষরাও বরাবর ব্যবহার করে আসছে

দক্ষিণ দিকে আসবার জন্য। ও পাহাড়টা থেকে বড় জলপথ মাইল পাঁচেকও হবে না বোধহয়।

বন্দীর নাম কান্টোস্ কান্। হেলিয়ামের বিমান বাহিনীর ও একজন লেফটেনান্ট। দেজা থোরিসের বৈজ্ঞানিক অভিযানের সঙ্গেই থার্কে এসে বিপদে পড়েছিল। যুদ্ধে হেরে জখম হয়ে কোনো-রকমে জাহাজ নিয়ে পালিয়ে গেলেও হেলিয়ামে পৌঁছুতে পারেনি। হেলিয়ামের জাত-শত্রু জোডাঙ্গার রাজধানীর ওপর দিয়ে উড়ে যাবার সময় ওদের খপ্পরে পড়ল। জোডাঙ্গীরাও কিন্তু লাল মঙ্গলবাসীদেরই জাত। কান্টোস্ কানের উড়োজাহাজটি ছাড়া দলের বাকি সব বিমান হয় ধ্বংস হল, নয় ধরা পড়ল। আর জোডাঙ্গীদের তিনখানা জাহাজ ওর পেছনে তাড়া করে এল বটে কিন্তু ভাগ্যক্রমে চাঁদহীন অন্ধকার রাতের সুযোগে শেষ অবধি পালিয়ে বাঁচল কান্টোস্।

দেজা থোরিস্ বন্দিনী হবার ত্রিশ দিন পর হেলিয়ামে ফিরেছিল কান্টোস্। মোট সাড়ে সাতশো অফিসার আর নাবিকের মধ্যে বেঁচে ফিরেছে দশজন। যা হোক্, সঙ্গে-সঙ্গেই আবার সাতটা নৌবহর পাঠানো হল দেজা থোরিসের সন্ধানে। একেকটা নৌবহরে একশোখানা করে বিশাল জাহাজ। সঙ্গে আবার হাজার দুয়েক ছোট বিমান একটানা অনুসন্ধানের কাজে ব্যাপৃত রইল। কিন্তু কোনো ফল হল না। সবুজ থার্কদের দুটো উপনিবেশ বারসুমের বুক থেকে একেবারে মুছে দিয়েছিল লাল মঙ্গলবাসীরা। কিন্তু তবু দেজা থোরিসের পাত্তা নেই। দক্ষিণ দিকে চড়াও হয়ে কান্টোস কান্‌রা বারহুনের শহরের মধ্যেই ঢুকে পড়েছিল। বারহুনে কান্টোস্ যা বীরত্ব আর সাহস দেখিয়েছিল তার প্রশংসা আমি না করে পারি না। ও একাই চুপি-চুপি শহরের প্রত্যেকটা বাড়ি আর কারাগার আতিপাতি করে খুঁজেছে কিন্তু অবশেষে ধরা পড়ে গেল একদল বারহুন যোদ্ধার হাতে।···

বন্দী থাকার সময়ে কান্টোস্ কান্ আর আমার মধ্যে বেশ বন্ধুত্ব গড়ে উঠল। ক'টা দিন যেতেই আমাদের দুজনকে ওরা কারাগার থেকে টেনে নিয়ে গেল খেলার প্রাঙ্গণে, যা অনেকটা রোমান এরিনারই মতো।

বিরাট গ্যালারির সারি, তাতে কুড়ি হাজার বারহুনের বসবার জায়গা। প্রাঙ্গণ বড় হলেও এবড়ো-খেবড়ো আর অগোছাল। পুরনো শহরের ইটপাথরের পাঁচিল খাড়া করে বন্দী বুনো জানোয়াগুলোকে আলাদা রেখেছে যাতে দর্শকদের মধ্যে এসে না পড়ে। তাদের জন্য আলাদা খাঁচা, লড়াই আর মৃত্যুর উৎসবের নিত্য নতুন বলি।

আমাকে আর কাণ্টোস কান্‌কে ওরা একসঙ্গে একটা খাঁচার মধ্যে বন্দী করে রেখেছে। অন্য খাঁচাগুলোয় বুনো ক্যালট্‌ কুকুর, জংলী থোট্‌, পাগলা জিতিদার, কিছু সবুজ যোদ্ধা আর অন্য জাতের স্ত্রীলোক। এ ছাড়া অজানা অনেক অদ্ভুত হিংস্রদর্শন প্রাণী যাদের আগে চোখেও দেখিনি। ওদের তর্জন-গর্জন অপার্থিব চিৎকারে কানে তালা লাগে, অতি সাহসীর বুকও কেঁপে ওঠে এককেটা বীভৎস জীবকে দেখলে।

কাণ্টোস কান বললে প্রথম দিনের খেলায় আজকের বন্দীদের শুধু একজন মুক্তি পাবে, বাকিগুলো মরে পড়ে থাকবে ময়দানে। সারাদিনে যতগুলো দ্বন্দ্বযুদ্ধ হবে তার থেকে মাত্র দু'জন বেঁচে থাকবে, আর সেই দু'জনের মধ্যে হবে আজকের শেষ লড়াই। যে বিজয়ী হবে আজ সে ছাড়া পেয়ে যাবে, মানুষ বা পশু যাই হোক সে। কাল সকালে আবার খাঁচা বোঝাই হবে নতুন বলির পশু দিয়ে। এইভাবে চলবে দশটা দিন!···

দেখতে দেখতে দর্শকদের আসনগুলো ভরে গেল, ঘণ্টাখানেক পরে আর তিলার্ধ স্থান রইল না সবুজ দানবদের ভিড়ে। দাক কোভা তার সাঙ্গপাঙ্গ নায়ক, সর্দার, মোড়লদের নিয়ে এরিনার পাশের দিকে একটা উঁচু মঞ্চের কেন্দ্রস্থলে বসেছে।···

দাক কোভার হাতের সংকেতে দুটো খাঁচার দরজা খুলে গেছে। একদিক থেকে মাঠে নেমে এল দশ-বারোজন সবুজ জাতের স্ত্রীলোক। তাদের প্রত্যেকের হাতে একটি করে ছোরা। অপর প্রান্ত থেকে এক ডজন বুনো ক্যালট্‌-কুকুরকে ছেড়ে দেওয়া হল ওদের ওপর।···প্রায় আত্মরক্ষাহীন মেয়েদের ওপর যখন জানোয়ারগুলো ঝাঁপিয়ে পড়েছে সোল্লাস চিৎকারে, আমি আর দেখতে পারলাম না সে ভয়ানক দৃশ্য।

মাথা ঘুরিয়ে নিয়ে কেবল শুনতে পেলাম সমবেত দর্শক দানবদের তুমুল হাসির আওয়াজ। সবুজদের চোখে তামাশাটা বোধহয় খুবই জমেছে! মাঠের দিকে তাকিয়ে দেখি তিনটে বিজয়ী ক্যালট্ শিকারের ছিন্নভিন্ন লাশগুলোর পাশে দাঁড়িয়ে গরগর্ করছে আর জিভ চাটছে।

এবারে একটা পাগল জিতিদার দানব-হাতিকে ছাড়া হল বাকি কুকুরগুলোর মধ্যে।···এইভাবে চলল সারা দিন।

আমায় ওরা বেশ ক'বার লড়াই করতে পাঠিয়েছিল, কখনো সবুজ দানবদের সঙ্গে, কখনো পশুদের সঙ্গে। আমার অস্ত্র লম্বা তরোয়াল, শত্রুদের চেয়ে শক্তি আর ক্ষিপ্রতা তুটোই আমার বেশি। তাই আমার কাছে লড়াইটা ছেলেখেলার মতো হল। যতবারই শত্রু নিপাত করি, রক্তপিপাসু জনতা উল্লাসে ফেটে পড়ে। শেষের দিকে সবাই রব তুলল আমায় এরিনা থেকে বের করে বারহুনদের সেপাই বানিয়ে দেয়া হোক।

অবশেষে সব প্রাণী খতম হয়ে আঙিনায় রইল মাত্র তিনজন—উত্তর অঞ্চলের এক বিশাল সবুজ দানব, কান্টোস্ কান্ আর আমি। আগে ওদের তুজনের লড়াই হবে, তারপর বিজয়ীর সঙ্গে লড়ব আমি।

কান্টোস্ কান্ সারাদিন দারুণ লড়েছে আর জিতেছেও প্রত্যেকবার। তবে সবুজ দানবদের সঙ্গে ওর মাঝে-মাঝে বেশ অস্থবিধাও হয়েছে। বিশেষ করে এবারের এই দানবটা ষোলো ফুট লম্বা। কান্টোসের উচ্চতা ছ'ফুটের একটু কম। আমার খুব একটা আশা রইল না কান্টোস্ সম্পর্কে।

কিন্তু কান্টোসের তলোয়ারের অপূর্ব কৌশল দেখলাম বটে। বিশাল ঘটোৎকচটার কুড়ি ফুটের মধ্যে এগিয়ে এসে ও তলোয়ারটা পেছন দিকে ঘুরিয়ে নিয়েই বোঁ করে ছুঁড়ে দিল তীক্ষ্ণ-ফলাটা সামনে রেখে। ঠিক তীরের মতো ছুটে গিয়ে তলোয়ারটা বিঁধল দানবটার হৃৎপিণ্ডের জায়গায়। সঙ্গে সঙ্গে সে প্রাণ হারিয়ে মাটিতে পড়ে গেল।

এবার কান্টোস্ কানের সঙ্গে আমি। পরস্পরের মুখোমুখি হতে আমি ফিসফিস করে বললাম সন্ধ্যার অন্ধকার আসা পর্যন্ত যেন সে লড়াই চালিয়ে যায়। ততক্ষণে পালাবার একটা উপায় বের করা যাবে।···

তেমন ভালো করে আমরা কেউই লড়ছি না দেখে দানব জনতা খেপে উঠেছে। কিন্তু ভ্রূক্ষেপ না করে, যেই একটু আঁধার হয়ে এসেছে, কাণ্টোস্‌কে চাপা গলায় বললাম আমার বাঁ-বাহু আর শরীরের ফাঁকে ওর তলোয়ারটা সজোরে গুঁজে দিতে। ও তা করতেই আমি বগলের তলায় তলোয়ারটা চেপে টলতে টলতে দড়াম করে মাটিতে পড়ে গেলাম। আমার বুকের ওপর জেগে রইল তলোয়ারের বাঁটের দিকটা।

কাণ্টোস্‌ আমার কৌশলটা ঠিকই বুঝতে পেরেছে। সেও চট্‌পট আমার কাঁধের ওপর পা চড়িয়ে দিল। আমার শরীর থেকে একটানে তলোয়ারটা বের করে আমার ঘাড়ের ওপর এক 'মোক্ষম' কোপ বসিয়ে দিল—মানে তলোয়ারের ফলাটা সোজা পুঁতে দিল এরিনার বালুর মধ্যে।

অন্ধকারে কেউ বুঝতে পারল না আমাকে ও সত্যিসত্যি সাবাড় করেছে কিনা। আমি নিচু গলায় বললাম এবার গিয়ে ও মুক্তি দাবি করুক। পরে যেন শহরের পুবদিকের পাহাড়ে আমার খোঁজ করে। কাণ্টোস্‌ চলে গেল।

মল্লভূমি শূন্য হয়ে যেতে আমিও চুপিচুপি গুঁড়ি মেরে বেরিয়ে পড়লাম। শহরের চত্বরটা এখান থেকে অনেক দূরে। মৃত শহরের এ অঞ্চলে বসতিও নেই। তাই পাহাড়ের দিকে এগিয়ে যেতে বিশেষ মুশকিল হল না আমার।

সতেরো

॥ বাতাবরণের কারখানায় ॥

কাণ্টোস কানের জন্য দুদিন অপেক্ষা করে রইলাম, কিন্তু তবু সে এল না দেখে শেষে পায়ে হেঁটেই রওনা দিলাম উত্তর-পশ্চিম দিক লক্ষ্য করে। কাণ্টোসই বলেছিল ওদিকে গেলে তাড়াতাড়ি জলপথটার কাছাকাছি পৌঁছুনো যায়। পথে দুধ ছাড়া কিছু পেটে পড়েনি, ওইটেই অঢেল পরিমাণে পাওয়া যায় দুধ-গাছগুলো থেকে। রাতের বেলায় চলি, দিনে লুকিয়ে থাকি পথের ধারে পাহাড়ি টিলার ফাঁক-ফাটলে।

মাঝে মাঝে জানোয়ারও আক্রমণ করেছে আমাকে। অজানা বীভৎস সব জন্তু রাতের অন্ধকারে ঘাড়ে এসে পড়েছে। তাই সব সময় লম্বা তলোয়ারখানা তৈরি রাখতে হয়। তবে আমার নতুন-শেখা অতি-মানসিক বোধশক্তিও খুব কাজে দিয়েছে—আগে থাকতেই আন্দাজ করতে পারি কেউ আচম্কা আক্রমণ করতে এলে। কিন্তু একবার একটা কী অদ্ভুত প্রাণী অন্ধকারে বুকের ওপর এসে চেপে বসল। চোখে দেখতে পাইনি, অনুভবে বুঝলাম মুখটা তার রোমশ, ভারি প্রকাণ্ড দেহ, অনেক-গুলো পা। তীক্ষ্ণ দাঁত সজোরে আমার গলায় বসাতে যাবে, আমিও প্রাণপণে যুঝতে লাগলাম ঠেলে সরিয়ে রাখার জন্য। ক্রমে কঠিন আঙুল দিয়ে পিষে ধরি তার কণ্ঠনালী। কিন্তু তবু কিছুতে ছাড়াতে পারি না। মাটিতে পড়ে ঝটাপটি চলতে থাকে। শেষে আমার হাত দুটো দুর্বল হয়ে আসে।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে অন্ধকারের ভেতর থেকে একটা মূর্তিমান বিভীষিকা লাফ দিয়ে পড়ে আততায়ী জানোয়ারটার ঘাড়ে। দুটিই একসঙ্গে জড়াজড়ি করে শেওলার ওপর পড়ে পরস্পরের টুঁটি কামড়ে ধরে। একটু বাদে ভয়ংকর লড়াই শেষ হল। যে আমায় বাঁচিয়েছে, সে মৃত জানোয়ারটার ওপর দাঁড়িয়ে মাথা নিচু করে তখনো তার টুঁটি খুঁজছে।

অন্ধকার একটি কোণে উলাটাকে টেনে নিয়ে গুঁড়ি মেরে বসে রইলাম। বুড়ো একটা লম্বা সরু ছোরা পাথরে শাণ দিচ্ছে ... বুড়োর মনের কথা সবই বুঝে ফেলেছি। ... পৃ.৯৩-৯৪

হঠাৎ দিগন্ত থেকে চাঁদ উঠে বারস্থুমের মাঠঘাট আবার দৃশ্যমান হল। আমার রক্ষককে চিনতে পারলাম। উলা! কিন্তু কোথা থেকে এসে হাজির হল? কেমন করেই বা খুঁজে পেল আমায়? ওকে পেয়ে খুশি তো হলাম, কিন্তু দেজা থোরিসদের উলা কোথায় ফেলে এল? বড় চিন্তার কথা। আমি ভাবলাম নিশ্চয় দেজার মৃত্যু হয়েছে। নইলে উলা আমার যেমন বাধ্য, কখনো তাকে একা ফেলে আসবে না।

পরিষ্কার চাঁদের আলোয় এবার দেখলাম উলা কত রোগা হয়ে গেছে—আগের সে চেহারাই নেই। আমার হাতের বাঁধন ছেড়ে সে মৃত জন্তুটার দেহের ওপর হামড়ে পড়ে যেভাবে মাংস ছিঁড়ে খেতে লাগল তাতে বুঝলাম বেচারার খাবার জোটেনি ক'দিন।

উলার খাওয়া শেষ হতে আবার নতুন করে ক্লান্ত দেহের ভার টেনে শুরু করলাম দীর্ঘ পদযাত্রা। কতো দূরে সে জলপথটা কে জানে!··· অবশেষে পনের দিন পরে ভোর বেলায় নজরে পড়ল উঁচু উঁচু গাছ। জলপথের ওই তো নিশানা। উল্লসিত হলাম। তাহলে লক্ষ্যে পৌঁছে গেছি!

দুপুর নাগাদ পৌঁছুলাম বিস্তীর্ণ প্রান্তরের এক দিকে একটা মস্ত বাড়ির দরজার সামনে। প্রায় চার বর্গ মাইল জুড়ে বাড়িটা। উঁচুও হবে দুশো ফুট। ভারি দেওয়ালের গায়ে অন্য কোনো ফটক নেই, শুধু এই ছোট দরজাটি ছাড়া। আশেপাশে জীবনেরও কোনো লক্ষণ নেই। কোনো ঘণ্টাও দেখছি না যে সাড়া দিয়ে ভেতরে কাউকে জানাব আমি আশ্রয় খুঁজছি। তবে একটা গোল ফুটো দেখতে পাচ্ছি পেন্সিলের মতো সরু। হয়তো ওটা কথা বলার জন্য কোনো ফোকর হবে ভেবে কিছু বলতে গিয়েছি, এমন সময় ওটারই ভেতর থেকে একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এলো। জিজ্ঞেস করল আমি কে, কোথা থেকে এসেছি এবং কী চাই।

অদৃশ্য গৃহস্বামীকে সব কিছু জানিয়ে বললাম যে আমি বারহুনদের হাত থেকে পালিয়ে এসেছি, খিদে আর ক্লান্তিতে আমার প্রাণ যাবার মতো।

—তোমার সাজসজ্জা সবুজ যোদ্ধাদের মতো, সঙ্গে একটা ক্যালট্

কুকুরও আছে, অথচ লাল মানুষদের মতো শরীরের গড়ন। তোমার রং লালও নয়, সবুজও নয়। হলপ করে বল তো কী ধরনের প্রাণী তুমি ?

—আমি বারস্থমের লাল মানুষদের বন্ধু। অনাহারে রয়েছি। মনুষ্যত্বের খাতিরে দরজটা তো খোলো!

সঙ্গে সঙ্গে দরজাটা পেছন দিকে সরে যেতে লাগল। প্রায় পঞ্চাশ-ফুট ভেতরে দিকে গিয়ে থামল, তারপর সরে গেল বাঁ দিকে। ভেতরে একটা সরু করিডর, তার পেছনে আরো একটা দরজা। আমি ঢুকতেই প্রথম দরজাটা ফের সরে এসে আগের মতোই দেয়ালে ফিরে গিয়ে বন্ধ হয়ে গেল। কংক্রিটের দশফুট পুরু দরজার ওপর মোটা মোটা লোহার গরাদ ছাদ থেকে নেমে এসে চেপে বসল। এর পর খুলে গেল দ্বিতীয় দরজার পাল্লা, তারপর তিন নম্বর আরেকটা দরজা। সেটা খুলতেই ভেতরে নজর করে দেখি একটা চমৎকার হল-কামরা। মাঝখানে একটা পাথরের টেবিলের ওপর রাখা আছে খাবার ও পানীয়। একটা কণ্ঠস্বর আবার বললে পেট ভরে খেয়ে নিতে, কুকুরটাকেও খাওয়াতে। আমার খাওয়া সাঙ্গ হলে অদৃশ্য গৃহকর্তা আমাকে বড় কঠিন জেরা করতে লাগল। সমস্ত প্রশ্নোত্তর শেষ হলে কণ্ঠস্বর বললে—তোমার বক্তব্যগুলো তো বেশ শোনার মতো। কিন্তু তুমি যে সত্যি কথাই বলছ তাতে সন্দেহ নেই, আর এও বেশ বোঝা যায় তুমি বারস্থমের জীব নও। সে তো তোমার মস্তিষ্কের গঠন, শরীরের ভেতরকার যন্ত্রপাতিগুলোর অদ্ভুত অবস্থান আর তোমার হৃৎপিণ্ডের আকার দেখেই বুঝতে পারছি।

আমি অবাক হয়ে বলি—আমার ভেতরের সব দেখতে পাচ্ছ ?

—হ্যাঁ। আমি সব কিছু দেখতে পাচ্ছি, শুধু তোমার চিন্তার থই পাচ্ছি না। বারস্থমের মানুষ হলে তোমার মনটা আমার সামনে পরিষ্কার ফুটে উঠত।...

কামরার ওপাশে হঠাৎ একটা দরজা খুলে গেল। মিশরের মমির মতো শুকনো একটা আজব চেহারার ছোটখাটো মানুষ এগিয়ে এল আমার দিকে। তার গলায় সরু সোনার বন্ধনী। তা থেকে ঝুলছে বড়সড়ো আকারের একটা ফলক। তার ওপর বড়-বড় একেকটা হীরে

বসানো, কিন্তু মাঝখানে শোভা পাচ্ছে একখানা অদ্ভুত পাথর। এক ইঞ্চি ব্যাসের রত্নটা থেকে নয় রকমের আলাদা আলাদা জ্যোতি ঠিকরে বেরুচ্ছে। পৃথিবীর বর্ণালী কাঁচে যে সাতটি রং ধরা পড়ে সে তো আছেই, তা ছাড়াও দুটি অপূর্ব সুন্দর রশ্মি, যা আমার কাছে একেবারে নতুন আর অজানা।

বুড়ো লোকটা আমার কাছে বসে ঘন্টার পর ঘন্টা নানা কথাই আলোচনা করলে। মজার কথা হল বুড়োর মনের সমস্ত কথাই আমি ধরতে পারছিলাম কিন্তু আমার মনের ভেতরের এতটুকু চিন্তার নাগাল সে পায়নি, শুধু মুখের কথায় যেটুকু প্রকাশ করেছি সেটুকু ছাড়া।··· আমার এই আশ্চর্য ক্ষমতার রহস্য সে বুঝতেও পারেনি। পারলে অনেক কথাই আমাকে বলত না।

এই বিশাল বাড়িটার মধ্যে রয়েছে মঙ্গলগ্রহের কৃত্রিম বাতাবরণের কলকব্জা। এখানকার যন্ত্র চালু রেখে গোটা মঙ্গলের জল-হাওয়াকে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে। মঙ্গলের সমস্ত প্রাণীকে জীইয়ে রেখেছে জল-হাওয়ার এই কৃত্রিম উৎপাদন। কিন্তু সমস্ত কর্মকাণ্ডটারই গোপন চাবিকাঠি সেই 'নবম' রশ্মি—বুড়োর গলার মণিহারে যে অপার্থিব ন'টি বর্ণালী জ্যোতি রয়েছে, তারই একটি। এ বাড়ির গম্বুজের ছাদে বসানো আছে এমন সব সূক্ষ্ম যন্ত্র যা দ্বারা সূর্যরশ্মি বিশ্লেষণ করে এই বিশেষ রশ্মিটাকে আলাদা করে নেয়া হয়। ছাদের অধিকাংশ জায়গা জুড়ে রশ্মি সঞ্চয় করে-রাখা বিশেষ আধার। বিদ্যুৎ চালনা করে সঞ্চিত রশ্মিশক্তিকে অবশেষে মঙ্গলগ্রহের পাঁচটি প্রধান বায়ুকেন্দ্রে পাম্প করে পাঠানো হয়। বায়ুকেন্দ্রে এসে বহিরাকাশের ইথার তরঙ্গের সঙ্গে স্পর্শ ঘটামাত্র তা আবহাওয়া মণ্ডলে পরিণত হয়।

এ বাড়ির সঞ্চিত ভাণ্ডারে যে পরিমাণ রশ্মিশক্তি মজুত আছে তা দিয়ে গোটা মঙ্গলগ্রহকে আরো এক হাজার বছর জলহাওয়া সরবরাহ করা চলে। ভয় শুধু পাম্প-যন্ত্র নিয়ে, পাছে কোনো আকস্মিক বিপৎপাতে সেটা বিগড়ে যায়।···

ভেতরের কারখানায় নিয়ে গিয়ে বুড়ো আমাকে দেখালে কুড়িখানা

রেডিয়াম পাম্পযন্ত্র যার মধ্যে মাত্র একটিকে ব্যবহার করেই পুরো গ্রহের প্রয়োজনীয় বাতাবরণ জোগান দেওয়া চলে। বুড়ো নাকি আটশো বছর ধরে একজন সহকারীর সাহায্যে নজর রেখে যাচ্ছে পাম্পযন্ত্রের ওপর। ছেলেবেলায় লাল বারসুমীরা এ কাজ শিখলেও আসলে মাত্র এই দুজনের ওপর এ কাজের ভার। তারাই জানে এ কারখানা-বাড়িতে ঢোকার রহস্য। এমনিতে এ বাড়ি দুষ্প্রবেশ্য, আকাশপথে বিমান আক্রমণও নিষ্ফল হবে।···বারসুম গ্রহের প্রত্যেক প্রাণীই জানে এ কারখানার ক্ষতি হওয়া মানে সর্বনাশ—তাদের জীবন নির্ভর করছে এই কারখানার ওপর।

একটা মজার জিনিস আবিষ্কার করলাম। এ বাড়ির ফটক খোলা বা বন্ধ করা হয় অতিমানসিক শক্তি প্রয়োগ করে। চিন্তা তরঙ্গের সমন্বয় ঘটিয়ে এ কাজ করা হয়, 'কম্বিনেশন' তালা খোলার মতো!··· বুড়োকে কথায় কথায় জিজ্ঞেস করি ভেতরে বসে সে কেমন করে ভারি দরজার পাল্লা খোলে। প্রশ্ন করা মাত্র তার মনে দ্রুত খেলে যায় মঙ্গলের ন'টি শব্দতরঙ্গের স্বরমাত্রা। কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে চাপা দিয়ে সে জবাব দেয় এ গোপন রহস্য সে কাউকে বলতে পারে না। অথচ ঐ ক'টা মুহূর্তেই আমি জেনে গেলাম মানসিক শব্দতরঙ্গের চাবি কাঠি!

বুড়োর মনে বোধহয় সন্দেহ ঢুকেছিল। লক্ষ্য করলাম হঠাৎ তার ব্যবহারটা যেন কেমন বদলে গেছে। মুখের কথায় স্বাভাবিক বন্ধুতা থাকলেও মনে সন্দেহ আর ভয়।···রাতে ঘুমোতে যাবার আগে বুড়ো বললে আমায় একটা চিঠি দেবে। চিঠিটা কাছাকাছি এলাকার একজন কৃষি-কর্মচারীকে দেখালে আমার জোডাঙ্গা শহরে যাওয়া সহজ হবে। জোডাঙ্গাই কাছেপিঠের একমাত্র বড় শহর।

—তুমি যে হেলিয়াম রাজ্যে যেতে চাও তা কিন্তু জোডাঙ্গার লোকদের জানিও না, খবরদার। ওরা পরস্পরের শত্রু, লড়াই চলছে। আমি আর আমার সহকর্মীর কিন্তু কোনো জাত নেই—আমরা সারা বারসুমেরই নাগরিক। এই যে ফলক দেখছ, এটাই আমার রক্ষা কবচ। এমনকি সবুজ দানবদের কাছেও!···তা হলে শুভরাত্রি! নিশ্চিন্তে

ঘুমোতে যাও।

হেসে বলল বটে কথাটা, কিন্তু বুড়োর মনের আসল ভাবটা একবার ধাঁ করে খেলে গেল আমার চোখের সামনে! পরিষ্কার একটা ছবির মতো আমি যেন দেখতে পাচ্ছি: রাতের অন্ধকারে আমার ঘুমন্ত দেহের পাশে বুড়ো দাঁড়িয়ে আছে, হাতে একটা লম্বা ছোরা। ছোরাটা আমার শরীরে বসিয়ে দিতে গিয়ে বুড়ো ভাবছে—আপশোস্ হচ্ছে কিন্তু বারসুমের সকলের কল্যাণের জন্য করতে হচ্ছে একাজ!—

দরজা ভেজিয়ে কামরা থেকে বেরিয়ে যেতে বুড়োর চিন্তার ছবি ঝপ্ করে কেটে গেল আমার মনের পর্দা থেকে।···কী করা যায়? এই মোটা দেয়ালের বাড়ি থেকে পালাই কী করে? ওকে এখুনি মেরে ফেলা আমার পক্ষে অতি সহজ কাজ, কিন্তু বুড়ো মরে গেলে আমি এখান থেকে কেমন করে মুক্তি পাব? আর এ কারখানা যদি বন্ধ হয়ে যায় আমি তো বাঁচবই না, মঙ্গলের কেউ বাঁচবে না, দেজা থোরিসও নয়, অবশ্য সে যদি এর মধ্যেই মরে না গিয়ে থাকে।

সাবধানে ঘরের দরজা খুলে বেরিয়ে পড়ি। পেছন পেছন উলা। ভেতর দিকে বড় দরজাটার দিকে এগোই। মাথায় এক মতলব এসেছে। আমি নিজেই ন'টা শব্দের চিন্তা-তরঙ্গ প্রয়োগ করে তালা খোলার চেষ্টা করব।···চুপিসাড়ে করিডরগুলো একের পর এক পার হয়ে আসি সেই বড় কামরাটার সামনে যেখানে আমি সকালে আহার করেছিলাম। গৃহকর্তা বৃদ্ধের কোথাও দেখা পেলাম না, রাতে কোথায় থাকে সে, তাও জানি না।

কামরাটার মধ্যে ঢুকতে যাচ্ছি এমন সময় খুট্ করে একটা সামান্য আওয়াজ কানে আসতে অন্ধকার করিডরের একটি কোণে লুকিয়ে পড়লাম। উলাটাকে টেনে নিয়ে গুঁড়ি মেরে বসে রইলাম।

বুড়ো অন্ধকারে আমাদের পাশ কাটিয়ে চলে গেল কামরাটার ভেতর। স্বল্প আলোর মধ্যে দেখলাম বুড়ো একটা লম্বা সরু ছোরা হাতে নিয়ে পাথরে শান দিচ্ছে। তারপর বুড়ো ভাবল রেডিয়াম পাম্পগুলো একবার তদারক করে আসবে। সেখানে আধঘন্টাটাক

কাটিয়ে ফিরে আসবে আমার শোবার ঘরে। তারপর কাজ সমাধা করবে। বুড়োর মনের কথা সবই বুঝে ফেলেছি।

বুড়ো কামরা থেকে বেরিয়ে পাম্পঘরের দিকে অদৃশ্য হতেই, আমি চুপিসাড়ে এগিয়ে গেলাম বড় দরজাগুলোর দিকে। একেবারে তিন নম্বর পাল্লাটা এবার চোখের সামনে।

প্রকাণ্ড তালাটার ওপর পূর্ণ মনোযোগ নিবিষ্ট করে আমি ন'টা শব্দের চিন্তা-তরঙ্গই প্রয়োগ করলাম।

দম চেপে সবুর করে আছি, অবশেষে ভারি দরজাটা আমার দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। এক জায়গায় থেমে আবার একপাশে সরে গেল নিঃশব্দে। একে একে বাইরের ছুটো দরজাও আমার অতিমানসিক শক্তির হুকুমে খুলে গেল। উলা আর আমি বাইরের অন্ধকারে পা ফেলেছি। মুক্ত!

ছায়ার অন্ধকারে তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে রাস্তার চৌমাথায় এসে পড়লাম। প্রথম চৌমাথা থেকে আরেকটু দূরে গেলে একটা সীমানা চিহ্ন। যখন সীমানাচিহ্নের ধারে প্রথম দেয়াল-ঘেরা জমিটাতে এসে ঢুকলাম তখন ভোর হয়ে গেছে। আশে-পাশে নজর করে দেখলাম কোনো বসতির আভাস পাওয়া যায় কিনা!

ছোট ছোট নিচু কংক্রীটের বাড়ি। কিন্তু দরজাগুলো যেমন ভারি তেমনি দুষ্প্রবেশ্য। হাজার ধাক্কাধাক্কি করেও কারুর সাড়াশব্দ পেলাম না। শেষে একটা দরজার সামনেই ক্লান্ত পরিশ্রান্ত দেহে শুয়ে পড়লাম। উলাকে বললাম পাহারা দিতে।

একটু বাদে উলার চাপা গর্জনে ঘুম ভেঙে গেছে। দেখি তিনজন লাল মঙ্গলবাসী একটু তফাতেই, হাতে রাইফেল বাগিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমি তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে কৈফিয়ত দিলাম—আমি নিরস্ত্র, তোমাদের শত্রু নই। সবুজ দানবগুলোর হাতে বন্দী ছিলাম। এখন জোডাঙ্গায় যেতে চাই। একটু খাবার আর বিশ্রাম পেলেই হয়। আর জোডাঙ্গার পথটা যদি দয়া করে বাতলে দাও।...

ওরা রাইফেল নামিয়ে হাসিমুখে এগিয়ে এল সামনে। আমার

বাঁ কাধের ওপর ডান হাতগুলো রেখে, অভিবাদনের কায়দায়, নানা প্রশ্ন করে চলল—আমি কে, কী বৃত্তান্ত, এইসব। তারপর আমাকে সঙ্গে নিয়ে চলল ওদেরই একজনের বাড়িতে—সে কাছেপিঠেই থাকে।

ছোট ছোট যে বাড়িগুলোর দরজায় ভোরবেলায় ধাক্কাধাক্কি করেছিলাম সেগুলো হল ওদের শস্য আর পশু রাখার জায়গা। এদের আসল বাড়ি বড়োবড়ো গাছের আড়ালে। লাল মঙ্গলবাসীদের অন্য সব বসতবাড়ির মতো রাতের বেলায় এসব বাড়িও জমি থেকে চল্লিশ পঞ্চাশ ফুট উঁচুতে তুলে রাখা হয়। গোল মোটা একখানা থামের ওপর খাড়া করে রাখে, থামটা মাটিতে বসানো ফাঁপা নলের ওপর ওঠা-নামা করে ছোট রেডিয়ামচালিত কলের সাহায্যে। রেডিয়াম ইঞ্জিনটা থাকে বাড়ির সামনের ঘরে।

রাতে বিপদ-আপদ থেকে বাঁচতে খামোখা দরজা-ফটক-তালা-আগলের ঝামেলা না করে লাল মঙ্গলবাসীরা সোজা বাড়িটাকেই শূন্যে তুলে দেয় নাগালের বাইরে! বাড়ি ছেড়ে কোথাও যেতে হলে সে-ব্যবস্থাও করা যেতে পারে বাইরে থেকে।

যার বাড়িতে এলাম তারা কয়েক ভাই, বউ ছেলেমেয়ে নিয়ে একই রকম তিনটে বাড়িতে থাকে—এই খামারের মধ্যেই। নিজেরা গায়ে খেটে কাজ করে না, সব সরকারী কর্মচারী। খামারের কাজ করে কয়েদী, যুদ্ধবন্দী, ট্যাক্স ফাঁকিদার, এই সব অপরাধীরা। খুব অতিথিপরায়ণ লোক এরা। বেশ কটা দিন ওদের মধ্যেই কেটে গেল। বিশ্রামও জুটল। ওরা আমার মুখে সব কাহিনীই শুনেছে—কেবল দেজা থোরিসের কথা আর বাতাবরণ কারখানার বুড়োর কথাই ওদের বলিনি। ওরা আমায় উপদেশ দিলে যেন আমার শরীরটা রং করে খানিকটা ওদের জাতের মতো করে, জোডাঙ্গাতেই একটা চাকরি খুঁজে নিই—হয় ফৌজে নয়তো উড়োজাহাজ বাহিনীতে। নিজেকে ওদের আস্থাভাজন করে শাসক-সভার কিছু বড় নেতার মধ্যে বন্ধু জোগাড় করতে পারলে তবেই আমার এসব গল্প ওরা বিশ্বাস করবে। সেটা করার একমাত্র উপায় সামরিক বিভাগে যোগ্যতা দেখিয়ে। বারসুমে ওরা যুদ্ধপ্রিয় জাত। লড়াকু যোদ্ধাদের ওপরেই

ওদের সবচেয়ে বেশি কৃপা। ধন-দৌলতও তাদেরই বেশি।

বিদায় নেবার সময় ওরা আমায় একটা ছোটখাটো পোষা থোট দিলে। ঘোড়ার মতো আকারের। বেশ শান্ত, দেখতে অবিকল বুনো বিশাল থোটগুলোরই মতো। আর এছাড়া কিছু লাল তেল দিলে সারা গায়ে মেখে নেবার জন্য। মাথার চুল লাল বারস্নুমী কায়দায় ছেঁটে দিলে, সামনে খাটো, পেছনে চারকোণা বাবরি ছাঁট। আগের সাজ-পোশাক খুলে জোডাঙ্গার সাজ দিলে ওদের টর্ বংশের নিশানা দিয়ে। একটা থলিতে কিছু জোডাঙ্গার পয়সাও দিলে তারা। মঙ্গলের মুদ্রা কিছু পৃথিবী থেকে আলাদা রকমের নয়, একটু ডিম্বাকৃতি।

ওদের দয়ার ঋণ শুধবো কী করে সে কথা জানাতেই ওরা বললে সে সবের অনেক সময় পাওয়া যাবে, যদি বারস্নুমে আমার লম্বা আয়ু থাকে। অবশেষে বিদায় নেওয়া গেল।

আঠারো

॥ জোডাঙ্গার বিমানযোদ্ধা ॥

জোডাঙ্গার পথে যেতে যেতে বারসুমের অনেক কিছুই জানলাম আর শিখলাম। বিশেষ করে খামারগুলো থেকে।

মঙ্গলের জল সেচনের মূল জলাধারগুলো অতি বিশাল—দুটি মেরুর বরফগলা জল সেখানে মাটির নিচে সঞ্চয় করা হয়। সে জল আবার নালা দিয়ে পাম্প করে পাঠানো হয় বিভিন্ন জনবসতির কেন্দ্রে। নালাগুলোর দু'ধার দিয়ে কৃষিখেত। কৃষিখেতগুলো জল দিয়ে ভাসিয়ে দেবার বদলে ওরা মাটির তলা দিয়ে চালান করে দেয় গাছের গোড়ায় গোড়ায়, তাতে করে অযথা মঙ্গলগ্রহের দামি জল বাষ্প হয়ে উড়ে যায় না। মঙ্গলের শস্য সর্বত্র একই রকম ফলে—জলাভাব নেই, বৃষ্টি নেই, ঝড় বাদল নেই, পোকামাকড় বা শস্যভূক পাখিও নেই।

এবারের যাত্রায় মঙ্গলগ্রহে এসে এই প্রথম মাংস খেলাম। খামার বাড়ির পোষা পুষ্ট প্রাণী, সরস সুমিষ্ট। তা ছাড়া রসালো ফলও খেয়েছি অনেক রকম। কিন্তু কোনো খাবারই পৃথিবীর সঙ্গে বিলকুল মেলে না।

পথে আসতে কয়েকজন বুদ্ধিমান অভিজাত মানুষের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তাদের সঙ্গে কথায় কথায় হেলিয়ামের প্রসঙ্গ উঠল। ওদের একজন প্রবীণ ব্যক্তি নাকি কয়েক বছর আগেও হেলিয়ামে কূটনৈতিক দলের সদস্য ছিলেন। দুঃখ করে বলছিলেন দুটো দেশের মধ্যে কেন যে যুদ্ধ বেধে গেল সেটাই দুর্ভাগ্যের কথা।

—হেলিয়ামের সত্যিকারের গর্ব সেখানকার সুন্দরী মহিলারা যাদের তুলনা সারা বারসুমে মেলে না, আর তাদের মধ্যে সেরা মর্স্ কাজাকের মেয়ে দেজা থোরিস্—পারিজাতের ফুল যেন!…সে বিমানযাত্রায় নিরুদ্দেশ হয়ে যাবার পর হেলিয়ামে যেন শোকের বন্যা বয়ে গিয়েছিল। …বিমানবহর জখম হয়ে ফেরার পথে আমাদের শাসক তাদের অকারণে আক্রমণ করে মহা ভুল কাজ করেছেন। 'এর ফলে একদিন

জোডাঙ্গা তাঁকে গদি থেকে নামিয়ে ছাড়বে।···এখনই দেখুন না, আমাদের বিজয়ী ফৌজ হেলিয়ামকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলেছে তবু জোডাঙ্গার মানুষদের মনে অসন্তোষ। এ যুদ্ধ জনপ্রিয় নয়, কারণ এ যুদ্ধের পেছনে ন্যায় বা নীতিবোধ কিছু নেই। হেলিয়ামের প্রধান বিমানবহর যখন রাজকুমারীকে খুঁজতে ব্যস্ত, সেই সময় অন্যায় সুযোগ নিয়েছে আমাদের বাহিনী। হেলিয়ামের রাজধানীর অবস্থা এখন করুণ, হয়তো কয়েক পক্ষকালের মধ্যেই তার পতন হবে।

এত সব কথা শোনার পর আমি উদাসীন ভাব করে প্রশ্ন করলাম—তা ওদের রাজকুমারী দেজা থোরিসের ভাগ্যে শেষ পর্যন্ত কী হল জানেন কিছু?

বৃদ্ধ জবাব দিলেন—সে মারা গেছে। একজন বন্দী সবুজ যোদ্ধার মুখেই এ খবর পাওয়া গেছে। থার্ক ডাকাতদের হাত থেকে নাকি পালিয়ে গিয়েছিল অন্য জগতের একটা অদ্ভুত প্রাণীর সঙ্গে। পরে আবার বারহুনদের পাল্লায় পড়ে। ওদের থোটগুলো মরু-সমুদ্রের মাঠে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, কাছেপিঠে চিহ্নও পাওয়া গেছে রক্তাক্ত লড়াইয়ের।···

এ খবরে কিছুই বিশেষ পরিষ্কার হল না আমার কাছে। আমি স্থির করলাম যতো শীঘ্র সম্ভব হেলিয়ামে পৌঁছে রাজকুমারী দেজার ঠাকুরদা তার্দোস্ মর্সকে জানাতে হবে; বলতে হবে মোটামুটি কোন্ অঞ্চলে তাঁর পৌত্রীকে পাওয়া যেতে পারে।

টর্ ভাইদের খামার বাড়ি ছেড়ে আসার দশদিন বাদে জোডাঙ্গায় পৌঁছলাম। উলাকে নিয়ে হয়েছে একটু মুশকিল। রাস্তায় যেখানেই লাল মানুষরা ওকে দেখেছে মোটেই খুশি হয়নি, অযথা তাদের বিরক্তি আকর্ষণ করেছি আমিও। উলা যে-জাতের জন্তু, লাল মানুষরা কখনো বাড়িতে পোষে না। অনেকটা নিউ ইয়র্কের রাস্তায় সিংহ নিয়ে চলার মতো আপদ বিশেষ। কিন্তু উলাকে ছেড়ে যেতে মন চায় না। শহরের প্রবেশপথ পর্যন্ত তাই বুঝে উঠতে পারিনি ওকে নিয়ে কী করব। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হলাম ওকে ত্যাগ করতে। বারসুমের ওই একটাই জানোয়ার জান-প্রাণ দিয়ে আমাকে ভালবেসেছে। কিন্তু ও সঙ্গে থাকলে আমার

অভিযান সফল হবে না। অনেক আদর করে শেষে ওকে বিদায় জানালাম। ভবিষ্যতে আমার কাজ সমাধা হলে নিশ্চয়ই একদিন ফের দেখা হবে এই বোঝালাম তাকে। থার্কদের দেশের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললাম ওদিকেই যেতে। মনটা খারাপ করে সে চলে গেল বটে, কিন্তু ব্যাপারটা সে বুঝেছে মনে হল।

টর্‌দের চিঠিটা সঙ্গে ছিল বলে সহজেই শহরের ঢোকার অনুমতি মিলল। পাঁচিল ঘেরা শহর। অতো ভোরের দিকে রাস্তাঘাট জনশূন্য। বাড়িগুলো থামের ওপর উঁচিয়ে রাখা, কবুতরের ঘরের মতো, আর ধাতুর থামগুলোকে যেন ইস্পাতের গাছের গুঁড়ি বলে মনে হচ্ছে। দোকানঘরগুলো অবশ্য মাটির ওপরেই। বারসুমে চোরের ভয় নেই। আসল ভয় এদের খুনখারাবির। টর্‌ ভাইরা আমাকে আগেই বলে দিয়েছিল শহরের কোথায় আস্তানা করলে সরকারী দালালদের কাছা-কাছি থাকতে পারব। ওদের দুয়েকজনকে ব্যক্তিগত চিঠিও দিয়েছে তারা। দেখলাম আর সব মঙ্গল শহরের মতো জোডাঙ্গাতেও একটা বিরাট চত্বর রয়েছে শহরের মাঝখানটায়।

ওখানেই যতো বড়বড় নেতা, শাসক, মোড়লদের বাড়িঘর। সরকারী বাড়ি, কাফে, দোকানঘরগুলোও সেখানে। মনোরম বাড়িঘর-গুলোর অপূর্ব স্থাপত্য আর বড় লন্‌গুলোতে ফুলবাগানের সৌন্দর্য অবাক বিস্ময়ে দেখতে-দেখতে চলেছি, এমন সময় একজন লাল মঙ্গলবাসীকে দেখি হন্‌হন্‌ করে আমার দিকে হেঁটে আসছে। আমাকে সে নজর করে দ্যাখেওনি, কিন্তু আমি তাকে চিনতে পেরেছি। তার কাঁধের ওপর হাত রেখে বললাম, কেওর্‌ কাণ্টোস কান!

সে বোঁ করে ঘুরেই তলোয়ারের ডগাটা রেখেছে আমার বুকের ওপর। কড়া গলায় বললে—কে তুমি? আমি সঙ্গে সঙ্গে এক লাফে পঞ্চাশ ফুট পেছিয়ে আসতেই সে হো-হো করে হেসে উঠল—ব্যস্‌ জবাবের প্রয়োজন নেই! বারসুমে কে আর এমন আছে যে রবার বলের মতো লাফাতে পারে! জন কার্টার এখানে কোথেকে এলে? বহুরূপীর মতো গায়ের রংও পাল্‌টাতে পারো বুঝি?

আমি সংক্ষেপে আগের সব ঘটনা কান্টোসকে জানালাম। ও এবার বললে—আমি তো ভীষণ ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। জোডাঙ্গীরা যদি আমার নাম ধাম জানতে পারে তাহলে আমার জায়গা জুটবে বাপ চোদ্দপুরুষ যেখানে চলে গেছেন সেইখানে।···হেলিয়াম রাষ্ট্রপতি তার্দোস মর্সের হুকুমে রাজকুমারী দেজা থোরিসকে খুঁজতে এসেছি এখানে। জোডাঙ্গার রাজকুমার সাব্ থান তাকে লুকিয়ে রেখেছে এই নগরে, রাজকুমারী দেজাকে বিয়ে করবার জন্য সে পাগল। জোডাঙ্গার রাজা থান্ কোসিস্ আমাদের দু'দেশের শান্তির শর্ত হিসেবে রেখেছেন ছেলের সঙ্গে তার বিয়ে। কিন্তু তার্দোস্ মর্স্ তাঁর দাবি মানবেন না, বলে পাঠিয়েছেন তিনি আর তাঁর প্রজারা বরং রাজকুমারীর মরা মুখ দেখবেন, তবু কন্যার অপছন্দ কোনো পাত্রের সঙ্গে বিয়ে দেবেন না।

কান্টোস্ কান্ আরো বললে—তিন দিন হল এখানে এসেছি কিন্তু রাজকুমারীকে কোথায় আটকে রাখা হয়েছে বুঝতে পারছি না। আজকেই আমার জোডাঙ্গার বিমানবাহিনীতে স্কাউট হিসেবে যোগ দেবার কথা। চাকরিটা জোগাড় করেছি সাব থানের আস্থাভাজন হবার আশায়—সাব থানই কিন্তু এদের বিমানবাহিনীর সর্বাধিনায়ক। দেখি এইভাবে যদি রাজকুমারীর হদিশ পাই। তুমি এসেছ জন কার্টার, খুব ভালই হয়েছে। আমাদের রাজকুমারীর তুমিও যে ভক্ত তা তো জানি। দু'জনে একসঙ্গে মিলে নিশ্চয় খুঁজে পাব তাকে।

এর মধ্যে নগর চত্বরে লোকজনের আসা-যাওয়া শুরু হয়ে গেছে। দোকান রেস্তোরাঁ সবই খুলে গেল। কান্টোস কানের সঙ্গে আমিও ঢুকলাম একটা জাঁকালো কাফেতে। সেখানে সব কিছু পরিবেশন করা হয় যন্ত্রের সাহায্যে। রান্নার শুরু থেকে শেষে গরম মুখরোচক খাবার টেবিলে এসে পড়া অবধি কারুর হাতের ছোঁয়া অবধি লাগে না। অতিথিরা নিজের পছন্দমতো বোতাম টিপে-টিপে যার যা রুচি আহার করে।

খাওয়া দাওয়া সেরে কান্টোস আমাকে ওদের বিমান স্কাউট বাহিনীর সদর আপিসে নিয়ে যায়। ওর নিজের উপরওয়ালাকে বলে আমার

নামটাও বাহিনীর তালিকাভুক্ত করতে। নিয়ম অনুযায়ী একটা পরীক্ষা দেবার কথা, কিন্তু কাণ্টোস কান বললে ঘাবড়াবার কিছু নেই, সে-ব্যাপারটা ওই সামলে নেবে। আমার পরীক্ষার হুকুমপত্রটা নিয়ে ও পরীক্ষকের কাছে গিয়ে নিজের পরিচয় দিল জন কার্টার বলে!

কান্ বললে, পরে ওরা একদিন নিশ্চয়ই বুঝতে পারবে ধোঁকাবাজিটা, কিন্তু সে হতে-হতে বেশ ক'মাস কেটে যাবে! তার অনেক আগেই আমরা এখান থেকে কাজ সেরে বেরিয়ে পড়ব নিশ্চয়। তারপর কটা দিন কান্ আমায় হাতে-কলমে ওদের বিমান চালনার কৌশল, আর ছোটখাটো জটিল কলকব্জা মেরামতের কাজ শেখালে। ওদের এক-সওয়ারীর বিমানগুলো ষোলো ফুট লম্বা আর তিন ফুট চওড়া, সামনে পেছনে সরু হয়ে গেছে ক্রমান্বয়ে। পাইলটের আসনের সামনে একটা ছোট শব্দহীন রেডিয়াম চালিত মোটরইঞ্জিন থাকে।

জোডাঙ্গায় আসার চতুর্থ দিনে আমার প্রথম বিমানে-ওড়া পরীক্ষা হয়ে যেতেই পদোন্নতি ঘটল—যার ফলে থান কোসিসের প্রাসাদে আস্তানা জুটে গেল। এগুলো ওদের ধরাবাঁধা নিয়ম।

বিমানে শহরের আকাশে উঠে বেশ কয়েকটা চক্কোর দেবার পর সেদিন কাণ্টোস কানের অনুকরণে একাই বেরিয়ে যাই দক্ষিণের দিকে। বিমান চালিয়েছি সর্বোচ্চ বেগে। একটা বড়ো খালের ওপর দিয়ে তীব্র গতিতে উড়ে যাচ্ছি। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে প্রায় দুশো মাইল উড়ে এসে হঠাৎ নজরে পড়ল নিচে তিনটে সবুজ যোদ্ধা পাগলের মতো থোট চালিয়ে ছুটেছে একটা খুদে মানুষ মূর্তির পেছনে। মানুষটা দৌড়ে আশ্রয় খুঁজছে খামার বাড়ির পাঁচিলের আড়ালে। দ্রুত গতিতে বিমানটিকে নামিয়ে আনি নিচের দিকে। যোদ্ধাগুলো যাকে তাড়া করেছে সে লাল মঙ্গলবাসী। শুধু তাই নয় আমারই বিমান-দলের তকমাধারী। কাছেই ওর ছোট বিমানটা, মাটিতে নামিয়ে বুঝি কিছু মেরামত করছিল। সেই সময় ওকে শত্রুরা দেখেছে।

সবুজ সেপাইরা হাতে লম্বা বর্শা বাগিয়ে থোটগুলোকে চালিয়েছে উন্মত্তের মতো। কে আগে জোডাঙ্গাবাসীর দেহে বর্শা গাঁথবে এই নিয়ে

বোধহয় ওদের প্রতিযোগিতা। আমিও আমার ছোট বিমানটিকে তীব্র বেগে এত নিচে নামিয়ে এনেছি সোজা ওদের মাথার ওপর, যে ডানার কিনারায় লেগে একজনের মুণ্ডু কেটে একদম ছিটকে পড়ল মাঠের ধারে। আর তার ধড়টা পড়ল থোটের মাথায়। বাকিরা হকচকিয়ে ভয়ে উল্টোদিকে পিঠটান দিলে।

আমি বিমানের গতি কমিয়ে ধীরে নেমে এলাম মাটিতে। বিস্মিত জোডাঙ্গাবাসী ভীষণ খুশি হয়ে আমায় প্রচুর ধন্যবাদ জানালে। বললে আমার আজকের এই কাজের জন্য নিশ্চয় যোগ্য পুরস্কার পাব, কারণ সে জোডাঙ্গা-নায়কেরই এক জ্ঞাতিভাই।...অযথা কথা বলে সময় নষ্ট করা ঠিক হবে না, কারণ সবুজ যোদ্ধারা আবার ফিরে আসতে পারে। তাড়াতাড়ি লেগে পড়লাম তার জখম বিমানখানা মেরামত করতে। এমন সময় দেখি সত্যিসত্যি বাকি দুটো সবুজ যোদ্ধা ফিরে আসছে থোটের পিঠে চেপে। থোট দুটো এরোপ্লেন দেখে বেচাল হয়ে গেল, কিছুতেই এগিয়ে আসবে না। অগত্যা দুটিতে মিলে পায়ে হেঁটেই এল হাতে খোলা তরোয়াল বাগিয়ে নিয়ে। আমি ধরলাম বড়টিকে, আর জোডাঙ্গীকে বললাম অন্যটার সঙ্গে লড়তে। আমার কাজ শেষ হতে কয়েক সেকেণ্ডও লাগেনি, কিন্তু আমার নতুন বন্ধুর অবস্থা ঘোরালো। আহত হয়ে মাটিতে পড়েছে, আর সবুজ দানবটা ওর গলার ওপর চাপিয়ে দিয়েছে পা। তলোয়ার প্রায় ফুঁড়ে দেয় আর কি, তখন আমি পেছন থেকে পঞ্চাশ ফুটের এক প্রচণ্ড লাফ দিয়ে সোজাই আমার তলোয়ার ঢুকিয়ে দিলাম সবুজ যোদ্ধাটার দেহে।

মেরামতের কাজ তাড়াতাড়ি শেষ করে যে-যার বিমান নিয়ে উঠে পড়ি মঙ্গলের আকাশে। দ্রুতগতিতে ফিরে আসি জোডাঙ্গা শহরে। শহরের কাছাকাছি আসতে দেখি নগরপ্রাকারের বাইরে প্রচুর লোকজন আর ফৌজী সেপাই জড়ো হয়েছে একটি ময়দানে। আকাশ ছেয়ে গেছে নানা বিমানে। রঙচঙে নিশান, সিল্কের প্রতীকচিহ্ন আর পতাকা মিলে উৎসবের আবহাওয়া।

আমার সঙ্গী ইশারায় আমাকে ধীরে চলতে বললে। পাশাপাশি

তার বিমান এনে আমাকে জানালে আমরা এগিয়ে গিয়ে শূন্য থেকেই অনুষ্ঠানটা দেখতে পারি। এ অনুষ্ঠানে যারা সাহস ও বীরত্বের কাজ দেখিয়েছে তাদের উপাধি বিতরণ করা হবে। এই বলে সে রাজকীয় পরিবারের নিজস্ব পতাকাচিহ্ন বিমানের গায়ে উড়িয়ে দিলে। আমরা দুজনে একসঙ্গে ভিড়-করে-থাকা উড়োজাহাজগুলোর ফাঁক দিয়ে এগিয়ে গেলাম সিধে প্রধান নায়ক ও তার অমাত্যদের মাথার ওপর। একজন অমাত্য থান্ কোসিসের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে আমার সঙ্গীর দিকে, থান কোসিস তাকে বিমান নিয়ে নিচে নেমে আসতে সংকেত করলেন। সেপাইরা কুচকাওয়াজের ঢঙে প্রধানের সামনে সার দিয়ে দাঁড়িয়েছে। আমার সঙ্গী তখন নায়কের সঙ্গে কী যেন গভীরভাবে আলোচনা করছে আর তিনিও মুখ তুলে তুলে আমার দিকে চাইছেন।

একটু পরেই সবাই চুপ করে যে যার নির্দিষ্ট জায়গায় দাঁড়াল। একজন সেনা অফিসার কয়েক ফুট এগিয়ে সৈন্যসারির ভেতর থেকে কাউকে নাম ধরে ডাকতে সে দু'ধাপ সামনে এসে দাঁড়াল। অফিসার তখন সৈন্যটির বীরত্বের কাজের কিছু বর্ণনা দিতে প্রধান-নায়ক সম্মতি জানিয়ে একটু এগিয়ে এসে একটা ধাতুর তকমা এঁটে দিলেন ভাগ্যবান সেপাইটার বাঁ কনুয়ের ওপর। এইভাবে দশজন মানুষকে সম্মান-পুরস্কার দানের পর সেনা অফিসার চেঁচিয়ে বলে উঠল—জন কার্টার, বিমান স্কাউট!

আমি তো অবাক্। তাড়াতাড়ি বিমানখানা জমিতে নামিয়ে পায়ে হেঁটে এগিয়ে গেলাম সেনা অফিসারের দিকে, ওদেরই কায়দায়। সেনা অফিসার উচ্চকণ্ঠে-সমবেত জনমণ্ডলীকে শুনিয়ে বলতে লাগল—জন কার্টার, আমাদের প্রধান নায়কের জ্ঞাতিভাইকে যেভাবে সাহস ও কৌশলের সঙ্গে আপনি রক্ষা করেছেন এবং একাকী তিনটি সবুজ দানব-যোদ্ধাকে যুদ্ধে পরাজিত করেছেন, আমাদের প্রধান নায়ক অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে তাই সম্মানচিহ্নে বিভূষিত করছেন···

থান্ কোসিস্ আমার দিকে দু'পা এগিয়ে সম্মানের তকমা দান করে বললেন—আমার ভাইয়ের মুখে শুনলাম তোমার অদ্ভুত কীর্তির সব

কথা। আশ্চর্য···তুমি যদি প্রধান নায়কের ভাইকে এভাবে বাঁচাতে পার তো স্বয়ং প্রধান নায়কের দেহ তুমি নিশ্চয় রক্ষা করতে পারবে। তোমাকে তাই রক্ষীবাহিনীর কর্মচারী হিসেবে নিয়োগ করলাম, এর পর থেকে তুমি আমার প্রাসাদেই থাকবে।

আমি তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে অনুষ্ঠানের পর বায়ুসেনাদের বাড়ির ছাদের ওপর যেখানে ওদের বিমানের ঘাঁটি সেখানে নিজের বিমানটি জমা দিয়ে ফিরে এলাম রাষ্ট্রীয় প্রাসাদে। সেখানে ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীর কাছে নিজের নতুন পরিচয় পেশ করলাম।

উনিশ

॥ রাজকুমারীর সন্ধান মেলে ॥

প্রাসাদের রাজকর্মচারীর ওপর হুকুম ছিল আমাকে জেডাকের দেহরক্ষী পদে বহাল করে যেন খাসকামরায় রাখা হয়। যুদ্ধবিগ্রহের সময় জেডাকের ওপর যখন-তখন দৈহিক আক্রমণের ভয়।

থান কোসিসের খাসকামরায় যখন আমাকে আনা হল, তিনি তখন তাঁর ছেলে সাব থানের সঙ্গে কথাবার্তায় ব্যস্ত। আরো সব অমাত্য সঙ্গে আছে তাই আমাকে লক্ষ্য করেননি। কামরার দেয়ালে চমৎকার সব পর্দা ঝুলছে যার ফলে দরজা জানলা আড়ালে পড়েছে। ছাদ আর ঘন কাঁচের মেঝে দিয়ে সূর্যের আলো আসার ব্যবস্থা! দেয়াল আর ঝোলানো পর্দার ফাঁক দিয়ে কামরার চারদিক ঘিরে সরু পথ রয়েছে। ওই সরু পথের মধ্যেই আমাকে লুকিয়ে পাহারা দিতে হবে যতক্ষণ থান কোসিস তাঁর খাসকামরায় আছেন। আমার কাজ শুধু প্রধান শাসককে রক্ষা করা আর যতোদূর সম্ভব দৃষ্টির আড়ালে থাকা। চার ঘণ্টা পর আমার ডিউটি বদল হবে।

পর্দাগুলোর কাপড় এমন অদ্ভুতভাবে বোনা যে ভেতর থেকে কিছু দেখা যাবে না, অথচ আমার তরফ থেকে ঘরের সব কিছু আমি পরিষ্কার দেখতে পাব।

আমি সবে জায়গা নিয়ে দাঁড়িয়েছি দেখলাম কামরার অপর দিকের পর্দা সরিয়ে চারজন রক্ষী ভেতরে ঢুকল, সঙ্গে একজন মহিলার মূর্তি। থান কোসিসের সামনে সেপাই রক্ষীরা ছু'দলে ভাগ হয়ে দাঁড়াল, আর জেডাকের সামনে উজ্জ্বল সুন্দর হাসিমুখে রাজকুমারী দেজা থোরিস্! আমার থেকে তার দূরত্ব কুড়ি ফুটও নয়।

জোডাঙ্গার যুবরাজ সাব থান তার দিকে এগিয়ে এসে হাতে হাত ধরে নিয়ে এল জেডাকের সামনে। থান কোসিস বিস্মিত চোখে উঠে দাঁড়িয়ে অভিবাদন জানালেন।

—আরে, হেলিয়ামের রাজকুমারী আজ আমার দরবারে কী মনে করে? দুদিন আগেও তুমি আমায় সাফ কথা জানিয়েছ যে আমার অধম পুত্রের চেয়ে বরং থার্কদের সবুজ-দানব তাল হাজুস্‌কে পছন্দ করবে?

দেজা থোরিস শুধু আরেকবার হাসলে—ঠোঁটের কোণে একটা দুষ্টুমির টোল খেয়ে গেল।

—বারসুমের সভ্যতার শুরু থেকে মেয়েদেরই এ ব্যাপারে প্রয়োজন মতো মন বদল করার অধিকার আছে। দুদিন আগে পর্যন্ত এঁর নিষ্ঠা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হতে পারিনি, কিন্তু আজ তা নয়। তাই আমার আগেকার উদ্ধত কথাগুলোকে ভুলে যেতে অনুরোধ করছি। হেলিয়ামের রাজকুমারী অঙ্গীকার করছে সময় হলেই জোডাঙ্গার যুবরাজ সাব থানকে সে বিয়ে করবে।

থান কোসিস্ জবাবে বললেন—তোমার সংকল্প শুনে সুখী হলাম। হেলিয়ামের প্রজাদের সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে যাবার ইচ্ছে আমার একেবারেই নেই। তোমার অঙ্গীকার মেনে নিয়ে অবিলম্বে আমাব প্রজাদের সামনে ঘোষণা করছি।

বাধা দিয়ে দেজা থোরিস বললে—আরো ভাল হত, থান কোসিস্, যদি আগে এ-যুদ্ধের নিষ্পত্তি করে তার পর আপনি ঘোষণাটা করতেন। কারণ যুদ্ধের শত্রুতার মাঝখানেই হেলিয়ামের রাজকুমারী নিজেকে কেন শত্রুর হাতে সমর্পণ করল এ নিয়ে আমাদের প্রজারা হতচকিত হবে।

সাব থান বলে উঠল—লড়াই কি এখুনি শেষ করে দেয়া যায় না? থান কোসিসের একটি কথাতেই শান্তি আসতে পারে। পিতা, আপনি হুকুম দিলেই আমার সুখের দিন এসে যায়, এ অপ্রিয় যুদ্ধের অবসান ঘটে।

থান কোসিস্ বললেন—আমরা দেখব কীভাবে হেলিয়ামের মানুষ শান্তি প্রস্তাবটা গ্রহণ করে। অন্তত তাদের কাছে সন্ধির প্রস্তাব করব আমি।

দেজা থোরিস এবার ঘুরে খাসকামরা থেকে প্রস্থান করল রক্ষীদের

সঙ্গে। আমি ভাবলাম, এই তো সেদিন দেজা থোরিস আমায় কতো কিছু বলল। এর মধ্যেই সব ভুলে গিয়ে হাসিমুখে ওর পরম শত্রুর ছেলেটিকে বিয়ে করবে? নিজের কানে কথাগুলো শুনেও কেমন বিশ্বাস হল না। ওর মুখ থেকে নিষ্ঠুর বাস্তব সত্যটা আমাকে সরাসরিই গোপনে শুনতে হবে। এই ভেবে চট্ করে পর্দাগুলোর আড়ালে সরু পথ দিয়ে বেরিয়ে আসি দরজার দিকে। ওই দরজাটা দিয়েই সে কামরা থেকে বেরিয়েছে। নিঃশব্দে এগিয়ে দেখি অনেকগুলো করিডর বিভিন্ন দিকে চলে গেছে। প্রায় গোলকধাঁধার মতো নানা শাখা-প্রশাখায় চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে গলিপথগুলো।

তাড়াতাড়ি সামনে যে পথ পাই সেটা ধরে ছুটে গিয়ে আরেকটা পথ ধরি। তারপর পথ হারিয়ে নিরাশ হয়ে দাঁড়াই এক জায়গায়। একটা পাশ-দেয়ালের ধারে দাঁড়িয়ে হাঁপাচ্ছি এমন সময় কানে এল কাছেপিঠে কথাবার্তার শব্দ। যে দেয়ালটার পাশে হেলান দিয়েছি তারই পেছন থেকে আওয়াজটা আসছে। একটু বাদে দেজা থোরিসের গলাও যেন শুনতে পেলাম।

এক-পা দু'-পা করে করিডর ঘেঁষে ওপাশের একটা দরজার সামনে হাজির হলাম। তারপর সাহস করে দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে দেখি একটা ছোট বসবার ঘর। সেখানে দেজার সেই চারজন রক্ষী বসে আছে। আমাকে দেখেই একজন সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল আমার এখানে কী কাজ।

বললাম—থান কোসিসের কাছ থেকে আসছি আমি। হেলিয়ামের রাজকুমারী দেজা থোরিসের সঙ্গে একটু একান্তে কথা বলতে চাই।

—তোমার হুকুমনামা?

কী বলছে লোকটা বুঝতে পারিনি, তবু আমি রক্ষীবাহিনীর সেপাই এইটুকুমাত্র বলেই সোজা এগিয়ে গেলাম কামরার ভেতরের দরজার দিকে। কিন্তু এত সহজে ভেতরে ঢোকা হল না। রক্ষীটা ছুটে আমার পথরোধ করে বললে—থান্ কোসিসের হুকুমপত্র বা সংকেতবাক্য ছাড়া কেউ আসতে পারে না। ঢোকার আগে একটা কিছু চাই।

আমি আমার পাশে ঝোলানো লম্বা তরোয়ালটায় চাপড় মেরে বলি —দোস্ত, আমার একমাত্র হুকুমনামা এইটে! এবার শান্তিতে পথ ছাড়বে?

জবাবে সেও নিজের তরোয়াল বের করে বাকি তিনজনকে ডাক দিলে। সবাই তরোয়াল হাতে খাড়া হয়ে গেল সামনের রাস্তা বন্ধ করে। প্রথম রক্ষীটা বললে—থান্ কোসিসের হুকুমে নিশ্চয় তুমি আসোনি। রাজকুমারীর কামরায় ঢুকতে তো পারবেই না, তোমাকে রক্ষীদের সঙ্গে থান্ কোসিসের কাছে যেতে হবে। তরোয়ালটা ফেলে দাও। আমাদের চার-চারজন সেপাইকে কাবু করার ক্ষমতা তোমার নেই।

এ রক্ষীটাকে আমার জবাব দিই একটা অতর্কিত আঘাতে। তিনজন শুধু রইল মোকাবিলা করতে। ওরা সোজা বান্দা নয়। আমাকে দেয়ালে প্রায় ঠেসে দিয়েছে, জান দিয়ে লড়তে হচ্ছে। ধীরে ধীরে কামরার একটা কোনা বেছে নিই, যেখানে আসতে হলে ওদের একজন একজন করে আসতে হবে। বিশ মিনিট ধরে চলল সংঘর্ষ। ছোট ঘরটা ইস্পাতের ঠন্‌ঠন্ আওয়াজে কামারশালের কারখানা হয়ে উঠেছে।

বিকট শব্দ শুনে দেজা থোরিস কামরার দরজার সামনে ছুটে এল। ওর কাঁধের পেছনে উঁকি দিচ্ছে সোলা। দেজার মুখের ভাব কঠিন, কোনো আবেগের লেশ নেই। ও যে আমাকে চিনতে পারেনি, সোলাও নয়—তা বেশ বুঝতে পারছি।

ভাগ্যক্রমে একটা আঘাতেই কাত হয়ে পড়ল দ্বিতীয় সেপাইটা। রইল আর দু'জন। কৌশল বদল করে দু'জনকে টেনে আনলাম এমন অবস্থায় যা আমাকে আগেও অনেক সম্মুখযুদ্ধে জিতিয়েছে। দশ সেকেণ্ডের মধ্যে পড়ল তিন নম্বর লোকটা। আর কয়েক মুহূর্তে শেষ যোদ্ধাটাও রক্তমাখা মেঝের ওপর গড়িয়ে মরে পড়ে রইল।

একসঙ্গে চারজন ভাল সেপাইকে খতম করে আমার মনটা খুব প্রসন্ন হয়নি, কিন্তু দেজা থোরিসের পাশে দাঁড়াবার জন্য আমি সারা বারসুমকে জনশূন্য করে ফেলতে পারি। খাপের মধ্যে ফের তরোয়াল

ঢুকিয়ে নিয়ে মঙ্গলের রাজকুমারীর সামনে এসে দাঁড়ালাম। সে আমাকে চিনতে না পেরে নির্বাক্ হয়ে তাকিয়ে রইল মুখের দিকে।

ফিস্‌ফিস্ করে বললে—কে তুমি, জোডাঙ্গী? আমার দুঃসময়ে আবার কোন্ শত্রুতার মতলব নিয়ে এসেছ?

জবাবে বললাম—আমি একজন বন্ধু।

—হেলিয়াম রাজকুমারীর কোনো বন্ধু ওই তক্‌মাধারণ করে না। কিন্তু গলার স্বরটা!...আগে যেন শুনেছি এ গলার স্বর! হতে পারে না—কেমন করে হবে? সে তো মরে গিয়েছে!

আমি হেসে বলি—কিন্তু রাজকুমারী! এ যে সেই। জন কার্টার ছাড়া আর কেউ নয়!

একবার শুধু হাত বাড়িয়ে আমার দিকে এগিয়ে এসেই দেজা পেছিয়ে গেল একটা অস্ফুট করুণ আওয়াজ করে।

—কিন্তু বড়ো দেরি, বড়ো দেরি করে ফেলেছ আমার সেনাপতি। আমি তো তোমাকে মৃত বলেই জানতাম। এক ঘণ্টা আগেও যদি ফিরে আসতে! এখন যে দেরি হয়ে গেল। অনেক দেরি!

—তার মানে? দেজা থোরিস, আমি বেঁচে আছি জানলে কখনো জোডাঙ্গার যুবরাজকে কথা দিতে না বলছ?

—তুমি কি ভাবো জন কার্টার, কাল তোমাকে মন দিয়েছিলাম আর আজ আরেকজনকে? আমি জানি, জানতাম, বারহুনের নরকের ছাইয়ের মধ্যে তোমার সঙ্গে আমার হৃদয়ও পুড়ে শেষ হয়েছে—তাই আজ বিজয়ী জোডাঙ্গা সৈন্যের অভিশাপ থেকে আমার প্রজাদের বাঁচাতে অঙ্গীকার করতে হয়েছে।

—কিন্তু আমি তো মরিনি রাজকুমারী। আমি যে তোমাকে দাবি করতে এসেছি, সারা জোডাঙ্গাও সে দাবি রুখতে পারবে না।

—বড়ো দেরি হয়ে গেছে জন কার্টার। আমি অঙ্গীকারবদ্ধ। বারসুমে সেইটেই শেষ কথা। আমি এখন বাগ্‌দত্তা, বিবাহিতাই বলতে পার। এখন থেকে আমরা পরস্পরের কেউ নই।

তাড়াতাড়ি ফিরে যেতে-যেতে সে আবার বললে—সাব থান বেঁচে

থাকতে আমি কখনো তোমাকে বিয়ে করতে পারি না।

বলে ফেললাম—তবে তো তুমি সাব থানের মৃত্যুদণ্ডে মোহর বসিয়ে দিলে, রাজকুমারী। সাব থান এবার মরবে!

না!—চোখ ঘুরিয়ে আমার দিকে চাইলে সে—তা কখনো হয় না। বারসুমের এও এক প্রথা জন কার্টার। এ ব্যাপারে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে কেউ নরহত্যা করলে সে তার বাঞ্ছিতাকে বিয়ে করতে পারে না। আমাদের এসব রীতিনীতি খুবই কঠোর জন কার্টার, তুমি তা ভাঙতে পারো না। তোমাকে মেনে নিতে হবে, যেমন আমি মেনে নিয়েছি। এবার যাও, দয়া করে চলে যাও। আর আমার সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা কোরো না, তার ফল ভাল হবে না। বিদায়, আমার পুরনো বন্ধু!

হতাশায় আচ্ছন্ন হয়ে গেছে মনটা—সারা সৃষ্টিই যেন চোখের সামনে থেকে লোপ পেয়ে গেল। কিন্তু তবু আশা ছেড়ে দেবার পাত্র আমি নই। শেষ অবধি হাল ছাড়ব না, যতক্ষণ না ওর সত্যিই বিয়ে হয়ে যায়।

খানিকক্ষণ আনমনা হয়ে ঘুরে বেড়ালাম প্রাসাদের ভেতরের অলিগলি দিয়ে। মাথায় কেবল দেজা থোরিসের কথাগুলোই ঘুরপাক খাচ্ছে। তারপর খেয়াল হল। জোডাঙ্গা শহর ছেড়ে পালানো ছাড়া তো পথ নেই। চারজন রক্ষী খুন হয়ে গেল, তার তদন্ত তো হবেই। এভাবে প্রাসাদের মধ্যে ঘুরে বেড়ালে আমার ওপর সন্দেহ ঘনিয়ে আসবে।

একটা ঘোরাপথের সিঁড়ি নিচে নেমে গেছে। সিঁড়ি ধরে বেশ কয়েকতলা নিচে নেমে একটা বড়ো হলঘরের দরজা দেখতে পেলাম। ভেতরে অনেকজন রক্ষী বসে কথাবার্তা বলছে। ভারি পর্দা ঝুলছে দেখে আমি তার আড়ালে লুকিয়ে পড়ি। সাধারণ গালগল্পের মধ্যে হঠাৎ একজন কর্মচারী এসে চারজন রক্ষীকে হুকুম দিলে হেলিয়ামের রাজকন্যার কামরায় গিয়ে আগের চারজন রক্ষীকে ছুটি দিয়ে তারা যেন পাহারায় বসে। বুঝলাম এবার আমার ঝামেলা শুরু হবে।

ঝামেলা কিন্তু একটু আগেভাগেই শুরু হল। চারজনের দলটা বেরিয়ে যেতে না-যেতেই ওদের একজন হন্তদন্ত হয়ে ছুটে ফিরে এল আবার। সে চেঁচিয়ে বললে, সর্বনাশ! রাজকুমারীর সামনের কামরায় চারজন রক্ষীই কোতল হয়ে পড়ে আছে! মুহূর্তের মধ্যে সারা প্রাসাদ চঞ্চল হয়ে উঠল। রক্ষী, কর্মচারী, অমাত্য, ভৃত্য সবাই এদিক ওদিক দৌড়োদৌড়ি করছে। করিডরে কামরায় হুকুম যাচ্ছে, আততায়ীকে খোঁজা হচ্ছে তন্নতন্ন করে।

এই সুযোগ বুঝে আমিও ওদের দলের মধ্যে ভিড়ে আততায়ীকে খোঁজার ভান করে প্রাসাদের গোলকধাঁধার মধ্যে ঘুরে বেড়াতে থাকি। তারপর একটা হলকক্ষের বড়-বড় জানালা দিয়ে বাইরের আলো আসছে দেখে অন্য সঙ্গীদের ছেড়ে চট করে চলে আসি একটা জানলার পাশে। জানলা ডিঙিয়ে মস্ত ব্যালকনির ওপর থেকে নজরে পড়ে শহরের এক চওড়া রাস্তা। ব্যালকনির তিরিশ ফুট নিচে জমি। প্রায় অতখানিই গেলে প্রাসাদ চত্বরের পাঁচিল। আগাগোড়া পালিশ কাঁচ দিয়ে তৈরি কুড়ি ফুট উঁচু পাঁচিলটা প্রায় দু'ফুট পুরু।

একজন লাল মঙ্গলবাসীর পক্ষে এ রাস্তায় পালানো অবশ্য দুষ্কর ব্যাপার। আমার পৃথিবীর শক্তি আর সবলতার কাছে এ সামান্য কাজ। কিন্তু দিনের আলোয় এতগুলো লোকজনের চোখের সামনে লাফ দিয়ে পালানো আমার পক্ষে সম্ভব হবে না। আপাতত একটা লুকোবার জায়গা বের করতে হবে।

দৈবাৎ পেয়েও গেলাম এমনি একটা জায়গা। হলঘরের ছাদ থেকে ঝোলানো প্রকাণ্ড ঝাড়বাতি জাতীয় কিছু সজ্জা, মেঝে থেকে প্রায় দশফুট উঁচুতে। অনায়াসেই লাফ দিয়ে ওটার মাথায় উঠে বড়সড়ো একটা গামলার মধ্যে ঢুকে বসে থাকি। শুনতে পেলাম বেশ কিছু লোকজন কথা বলতে বলতে এ ঘরটার মধ্যেই আসছে। তারা ঝাড়বাতিটার নিচে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল, প্রত্যেকটা কথা পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছি।

—এ নিশ্চয় হেলিয়ামীদের কাজ।

—হ্যাঁ জেডাক! কিন্তু প্রাসাদের মধ্যে কেমন করে ঢুকল?

ছ'সাতজন লোক অস্ত্র নিয়ে এতগুলো সেপাইয়ের চোখে ধুলো দিলে? আমার মাথায় তো কিছুতেই ঢুকছে না। ওই তো আমাদের অপরাধ-বিজ্ঞানী এসে গেছেন! ওর মুখেই শোনা যাবে।

শাসককে যথাবিহিত অভিবাদন জানিয়ে আরেকটি লোক এল দলের মধ্যে।

—জেডাক, আপনার বিশ্বাসী রক্ষীদের মৃত মস্তিষ্কের মধ্যে এক অদ্ভুত কাহিনী জানতে পারছি যে! ওরা ঘায়েল হয়ে মারা পড়েছে একটি মাত্র প্রতিদ্বন্দ্বীর হাতে, অনেকগুলো যোদ্ধার হাতে নয়।

একটা অস্ফুট বিস্ময়ের আওয়াজ বের হল থান কোসিসের মুখ দিয়ে।

—কী আষাঢ়ে গল্প শোনাচ্ছ, নোটান?

—কিন্তু এ যে সত্যি, জেডাক: চারটি রক্ষীর প্রত্যেকের মগজে পরিষ্কার ছাপ পড়েছে—ওদের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল খুব লম্বা মানুষ, আপনার রক্ষীদের মতো পোশাক পরা। লড়াইয়ের ক্ষমতা অসাধারণ, চারজনের সঙ্গেই নিয়ম মাফিক লড়েছে। কৌশল, অতিমানবিক শক্তি আর সহ্য ক্ষমতা, তিনটেই পুরোমাত্রায় আছে তার। জোডাঙ্গার বেশ ধারণ করলেও এমন মানুষ বারসুমের কোনো দেশে আগে দেখা যায়নি।...হেলিয়ামের রাজকুমারীকেও আমি জেরা ও পরীক্ষা করেছি, কিন্তু তার মন দেখলাম ফাঁকা। সে লড়াইয়ের একটা অংশ স্বচক্ষে দেখেছে, সেও একজন লোককেই দেখেছে ওদের সঙ্গে লড়তে—যাকে সে চিনতে পারেনি।

এবার হঠাৎ থান কোসিসের সেই জ্ঞাতিভায়ের গলার আওয়াজ শোনা গেল যাকে আমি সবুজ দানবদের খপ্পর থেকে বাঁচিয়েছিলাম।

—সেই মানুষটা কোথায় গেল যে আমাকে বাঁচিয়েছিল? আমি হলপ করে বলছি আততায়ীর বর্ণনাটা হুবহু সেই লোকটার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে—বিশেষ করে লড়াইয়ের কায়দাটা।

থান কোসিস চেঁচিয়ে উঠলেন—কোথায় সে লোক? এখুনি আমার সামনে তাকে হাজির কর। এখন আমারও তাই মনে হচ্ছে, এমন লোকের কথা তো জোডাঙ্গাতে কেউ কোনোদিন শুনিনি। আজই হঠাৎ কোত্থেকে এসে উদয় হল? তাছাড়া ওর নামটা—জন কার্টার—বাপের

জন্মে বারসুমে কেউ শুনেছে অমন নাম ?

খবর আসতে বিলম্ব হল না। আমাকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। প্রাসাদেও নয়, আমার বিমানবাহিনীর আস্তানাতেও নয়। কান্টোস কানকে ওরা পেয়েছিল, জেরাও করেছে, কিন্তু সে আমার গতিবিধির কোনো খবরই রাখে না। অতীতের যেটুকু ও জানে আমার সম্পর্কে, সে ওই বারহুনদের হাতে বন্দী থাকার সময়।

থান কোসিস হুকুম দিলেন—এ লোকটার ওপর নজর রেখো। এও তো বাইরে থেকে এসেছে। হয়তো দুজনেই হেলিয়ামের, কে জানে! একজনকে নজরে রাখলে হয়তো দ্বিতীয়জনকেও আজ হোক কাল হোক ধরে ফেলব। বিমান-পাহারা চারগুণ বাড়িয়ে দাও। শহর থেকে আকাশপথে বা ডাঙার পথে কেউ বেরুতে চাইলে কড়া তল্লাসী করবে।

আরেকজন দূত এসে এবার জানালে, মনে হচ্ছে আততায়ী এখনো প্রাসাদেই লুকিয়ে আছে। থান কোসিস সন্তুষ্ট হয়ে বললেন—তাহলে আর যাবে কোথায়, এখুনি ফাঁদে পড়বে। এর মধ্যে হেলিয়াম রাজকুমারীর ঘরে যাওয়া যাক—যতোটুকু সে বলেছে তার চেয়ে বেশিই হয়তো সে জানে! এসো!

কুড়ি

॥ আকাশে পথ-হারা ॥

ওরা হলকামরা থেকে বেরিয়ে যাবার পর একটু বাদেই সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এল। আমি লুকোবার জায়গা থেকে নিঃশব্দে নেমে এসে ব্যালকনির দিকে ছুটে গেলাম। কাছে পিঠে কেউ নেই দেখে এক সময়ে চট্ করে লাফিয়ে পড়লাম নিচে, তারপর কাঁচের দেয়ালটা ডিঙিয়ে বেরিয়ে এলাম প্রাসাদের বাইরে সেই বড় রাস্তার ওপর।

গা-ঢাকা দেবার চেষ্টা না করে সোজা চলে গেলাম পুরনো আস্তানায়। জানি সেখানে কান্টোস কানের দেখা পাবই। বাড়িটার সামনে এসে অবশ্য সাবধান হতে হল, কারণ ওখানে নিশ্চয় পাহারা থাকবে। সামনের গেটে অনেক লোকজন ঘোরাফেরা করছে। তাই এপাশে একটা দোকানঘরের ছাদে উঠে পর পর আরো কয়েকটা ছাদ ডিঙিয়ে চলে এলাম ওবাড়ির পাশের একটা খোলা জানলার কাছে। আর দু'মিনিটের মধ্যে যেখানে তাকে পাব বলে আশা করেছি, দেখি সেই কামরাতেই সে একা বসে আছে। আমাকে দেখে অবাক হল না মোটেই। অনেকক্ষণ থেকে নাকি আমার জন্য অপেক্ষা করছে।

বুঝলাম আজকে সারাদিনে প্রাসাদে যা-সব কাণ্ড হয়েছে তার বিন্দুবিসর্গও জানে না কান্টোস। যখন সব কথা ওকে বললাম, ও দারুণ উত্তেজিত হয়ে উঠল। দেজা থোরিস সাব থানকে বিয়ে করবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে এ খবরে ও ভয়ানক হতভম্ব হয়ে গেল।

—এ কী করে হয়! অসম্ভব! জোডাঙ্গার শাসক পরিবারে দাসীবৃত্তি করবে আমাদের রাজকুমারী? হেলিয়ামের লোকেরা শুনলে উন্মাদ হয়ে যাবে। এমন অদ্ভুত প্রস্তাবে যদি সে রাজি হয়ে থাকে তো তার মাথার ঠিক নেই। তুমি তো বাইরের লোক, তুমি বুঝবে না আমরা হেলিয়ামের মানুষরা আমাদের শাসকের পরিবারকে কী শ্রদ্ধার

চোখে দেখি। এ খবর কানে শুনেই আতঙ্ক হচ্ছে আমার।···কী করা যেতে পারে জন কার্টার। তোমার তো অনেক বুদ্ধি থাকে মাথায়, বলো না কীভাবে হেলিয়ামকে এ অপমানের কলঙ্ক থেকে বাঁচানো যায়?

জবাব দিই—সাব থানকে তরোয়ালের নাগালের মধ্যে পেলে আমি নিজেই হেলিয়ামের সমস্যা ঘুচিয়ে দিতে পারি। যদিও ব্যক্তিগত কারণে আমি বরং চাইবো আমার বদলে আর কেউ সেই তরোয়ালের কোপটা বসাক্।

কাণ্টোস কান আমার দিকে চোখ ছোট ছোট করে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ। তারপর বলল—বুঝেছি! তুমি রাজকুমারীকে ভালবাসো। কিন্তু সে জানে একথা?

—সে জানে কাণ্টোস, কিন্তু সাব থানকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে বলে আমায় সে পেতে পারে না।

কাণ্টোস কান এক হাতে আমার কাঁধ চেপে অন্য হাতে তরোয়াল উঁচিয়ে বলে উঠল—আমার হাতে যদি পছন্দের ভার থাকত তাহলে বারসুমের রাজকুমারীর জন্য তোমার চেয়ে যোগ্য জীবনসঙ্গী আমি আর কাউকে পেতাম না! সাব থান মরবে। আমারই তলোয়ারের ডগায় মরবে হেলিয়ামের জন্য, দেজা থোরিস আর তোমার জন্য। আজ রাতেই আমি তার প্রাসাদঘরের আস্তানায় হানা দেব!

কেমন করে?—প্রশ্ন করি আমি—তোমার এখানে কড়া পাহারা, আকাশে বিরাট বিমানবাহিনী নজর রেখেছে।

মাথা নিচু করে কী যেন ভাবলে কাণ্টোস্। তারপর বেশ আত্মস্থ ভাবে বললে—এখানকার রক্ষীগুলোকে একটু ফাঁকি দিতে পারলেই কাজটা আমি করতে পারি। প্রাসাদের সবচেয়ে উঁচু গম্বুজটার চূড়োর ভেতর দিয়ে একটা গোপন পথের অস্তিত্ব আমার জানা আছে। একদিন প্রায় হঠাৎই আবিষ্কার করে ফেলেছিলাম। বিমানে ঘুরে পাহারা দিতে গিয়ে প্রাসাদের ওপর দেখি সবচেয়ে উঁচু চূড়োর ভেতর থেকে উঁকি দিচ্ছে একটা মুখ—সে মুখটা আমাদের সাব থানের!···সাব থানকে অমন একটা জায়গায় দেখে ফেলেছি বুঝে সেও যেন কেমন অস্বস্তির

মধ্যে পড়েছিল। আমায় হুকুম দিয়েছিল ব্যাপারটা যেন প্রকাশ না করি, কারণ গম্বুজের চূড়ো থেকে সোজা পথ গিয়েছে তারই ঘরে—এ খবরটা সে ছাড়া প্রাসাদেরও কেউ জানে না।···বিমানবাহিনীর ব্যারাক বাড়ির ছাদ থেকে আমার বিমানখানা হাতাতে পারলে পাঁচ মিনিটেই সাব থানের ঘরে গিয়ে হাজির হতে পারি। কিন্তু তার আগে এ বাড়ি থেকে বেরোই কেমন করে?

—বিমানগুলোকে পাহারার কেমন ব্যবস্থা রেখেছে ছাদের ঘাঁটিতে?

—সাধারণত রাতের বেলায় একটি লোকেরই হেফাজতে থাকে।

—তাহলে কাণ্টোস কান্, এবাড়ির ছাদে গিয়ে আমার জন্য অপেক্ষা কর!

আমার মতলবের কথা বিশদভাবে কিছু না বলেই বেরিয়ে পড়লাম রাস্তায়। তারপর দ্রুতপদে চললাম বিমান ঘাঁটির দিকে, মানে সেই ব্যারাক বাড়ির দিকে। ঢোকার সাহস হল না, কারণ সেখানে এখন বিমান স্কাউটদের দল ভিড় করে আছে, আমারই সন্ধান করছে তারা।

হাজার ফুট উঁচু বিশাল বাড়িখানা। সোজা দেয়াল বেয়ে চড়তে গেলে সময় লাগবে, বিপদও আছে তাতে। কিন্তু উপায়ই বা কী। তবে একটা সুবিধা, বারসুমের বাড়িগুলো পৃথিবীর সরকারী অট্টালিকার মতো চাঁচাছোলা নয়, নানা অলঙ্করণের কাজ তাদের স্থাপত্যে। তাতে করে আমার পক্ষে সহজই হল কাজটা। বিচিত্র কার্নিশ আর হাজারো রকমের খোদাই করা নকশা আমার পক্ষে জুতসই মইয়ের কাজ করলে। সোজা গিয়ে উঠলাম ছাদের নিচে কিনারা অবধি।

এখানে এসে হল মুশকিল। কিনারার অংশটা দেয়াল থেকে কুড়ি ফুট এগিয়ে ঝুঁকে আছে রাস্তার ওপর। দেয়ালের ওপরেও কোনো ঘুলঘুলি বা প্রবেশ পথ নেই। একেবারে ওপরের তলায় আলো, লোকজনের হল্লা। ঘরের ভেতর দিয়ে ছাদে যাওয়ার প্রশ্ন ওঠে না।

একটাই উপায়। দেয়ালে এক হাত আর এক পায়ে ভর রেখে

কোমর থেকে খুলে নিলাম বৈমানিকদের লম্বা চামড়ার ফিতে। সেটার মাথায় একটা হুক্, বিমানের গায়ে লট্‌কে দিয়ে অনেক সময় জরুরি মেরামতির কাজ করতে হয়। সাবধানে কয়েকবার ছুঁড়ে ছুঁড়ে চেষ্টা করতে অবশেষে ফিতের হুক্‌টা আটকে গেল ছাদের কিনারায়। ধীরে টেনেটুনে দেখলাম শরীরের ভার সইতে পারবে কিনা। যদি ভালোভাবে হুক্‌টা না আটকে থাকে তবে তো একবার দোলন খেয়ে ওপাশে গেলে ছাতের কিনারা ফস্‌কে একেবারে হাজার ফুট নিচে!

একটু ইতস্তত করে, তারপর যা থাকে বরাতে ভেবে, দেয়াল থেকে হাত পা ছেড়ে দিলাম। একবার একটু ঝাঁকুনি, তারপর খরখর করে ফিতের হুকটা সরে এল। ভয়ে আমার কালঘাম ছেড়েছে।···কিন্তু হুক্‌টা আটকে গেছে যখন, আমি নিশ্চিন্ত। ফিতে ধরে উপরে উঠে ছাদের কিনারাটা চেপে ধরি। তারপর শরীরটাকে ঘুরিয়ে ছাদের ওপরে নিয়ে আসি।

খাড়া হয়ে উঠতেই সামনে রুখে দাঁড়াল ছাদের ওপর কর্তব্যরত শাস্ত্রী—তার রিভলবারের মুখটা ঠিক আমার চোখের দিকে তাক্ করা। সে গর্জন করে উঠল—কে হে তুমি? কোত্থেকে এলে?

—দোস্ত, আমি বিমান স্কাউট, আধমরা···দেখতেই পাচ্ছ। আরেকটু হলেই নিচের রাস্তায় পড়ে যেতাম, একটুর জন্য বেঁচেছি···

—কিন্তু ছাদের ওপর এলে কেমন করে? নিচে থেকে কেউ ছাদে আসেনি, কোনো বিমানও ছাদে নামেনি প্রায় ঘণ্টা খানেক। কী তোমার কৈফিয়ৎ? নাকি রক্ষীদের ডাকব?

—শাস্ত্রী ভাই, দেখ, এই দেখে যাও কেমন করে এখানে এসেছি, আর কেমন করে আমার আসাটা আরেকটু হলে চিরকালের মতো যাওয়া হয়ে যেত!—বলে ফিরে যাই ছাদের কিনারাটায় যেখানে কুড়ি ফুট নিচে চামড়ার ফিতেটার সঙ্গে আমার অস্ত্রশস্ত্রগুলো ঝুলছে। শাস্ত্রীটা কৌতূহলী হয়ে আমার পাশে দাঁড়িয়ে ঝুঁকে পড়ে যেই দেখতে যাবে, আমি ওর গলাটা টিপে ধরলাম। আরেক হাতে চেপে ধরলাম ওর পিস্তলটা। এক ঝট্‌কা মেরে শুইয়ে দিলাম ছাদে! লোকটার হাত

থেকে পিস্তল খসে পড়ল, গলা দিয়েও একটা আওয়াজ বেরুল না। মুখ বেঁধে ওকে ঝুলিয়ে দিলাম ছাদের কিনারায়।

আমার অস্ত্র আর ধড়াচুড়ো বেঁধে নিয়ে ছুটে গেলাম শেডের নিচে। আমার আর কাণ্টোসের ছুটো বিমানই টেনে বের করলাম। চুম্বক নিয়ন্ত্রণের সাহায্যে পাশাপাশি ছুটো বিমান জুড়ে নিয়ে স্টার্ট দিলাম আমার ইঞ্জিনে। তারপর ছাদের কিনারা দিয়ে নিচে নেমে উড়তে লাগলাম যতটা নিচে দিয়ে ওড়া যায়—যাতে টহলদার বিমানের নজরে না পড়ে যাই। মিনিট খানেকের মধ্যে নির্বিঘ্নে এসে গেলাম আমাদের আস্তানার ছাদে। একেবারে বিস্মিত হয়ে গেছে কাণ্টোস্ কান।

আর সময় নষ্ট না করে ওকে বুঝিয়ে বললাম কী করতে হবে। আমি এখন সোজা চলে যেতে চেষ্টা করব হেলিয়ামের দিকে। কাণ্টোস্ ঢুকবে প্রাসাদ বাড়িতে। সাব থানকে সাফ করে দেবে। সফল হলে আমাকে অনুসরণ করবে সে।

কাণ্টোস্ আমার কম্পাসের কাঁটা ঠিক করে দিল—বারসুমের যে কোনো প্রান্ত থেকে একেবারে সঠিক দিক্ নির্ণয় করা যায় ওতে। পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ছু'জনেই আকাশে উঠলাম।

উঁচু গম্বুজের কাছাকাছি আসতে একটা টহলদারি বিমান গুলি ছুঁড়লে আমাদের ওপর। আমার বিমানের গায়ে তীব্র সার্চলাইটের আলো। সগর্জনে হুকুম এল থামবার জন্য। গ্রাহ্য না করতে আবার গুলি। কাণ্টোস ওদিকে গোত্তা মেরে অন্ধকারে মিলিয়ে গেছে। আমি প্রচণ্ড বেগ বাড়িয়ে দিয়ে উড়ে চলি—পেছনে ডজনখানেক বিমান তাড়া করেছে। প্রথমে আঁকা-বাঁকা পথে চললেও পরে ঠিক করলাম সিধে উড়ে যাব যন্ত্রের সর্বোচ্চ গতির ওপর নির্ভর করে, তাতে যা হয় হবে।

কাণ্টোস্ কান আমাকে গীয়ার প্রয়োগের বিশেষ একটা কৌশল শিখিয়ে দিয়েছিল। হেলিয়ামের বৈমানিকরাই শুধু কৌশলটা জানে। এতে করে বিমান অবাধে উচ্চতম বেগে ধাবিত হতে পারে। ওদের গুলিগোলা যদি এড়াতে পারি খানিকক্ষণ, তাহলে জোরে চালিয়ে ওদের অনেক আগে চলে যাব এই ছিল আশা। কিন্তু যেভাবে ওদের গুলি-

গোলা সাঁই সাঁই করে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে, ভয় হল আকাশে টি'কে থাকতে পারব কিনা। বিমানটাকে পূর্ণ বেগে চালিয়ে দিয়েছি হেলিয়াম রাজ্য লক্ষ্য করে। অবশেষে ওরা খানিকটা পেছনে পড়ে গেল।

কিন্তু তারপরেই একটা ক্রুজার উড়োজাহাজ থেকে সঠিক লক্ষ্য করে ওরা এমন একটা গোলা ছুঁড়ল যা আমার ছোট বিমানের লেজের ওপর সজোরে আঘাত করল। বিমানটা প্রায় উল্টে গিয়ে মাথা নিচু করে পড়ে যেতে লাগল নিচে।

কতটা নিচে নেমে এসেছিলাম জানি না, তবে বিমানটাকে আবার খানিকটা তাঁবে এনেছি মনে হল। মাটির কাছাকাছি এলেও আবার ওপরের দিকে উঠতে লাগলাম। এবার ঘাড় ফিরিয়ে দেখতে চেষ্টা করলাম আকাশটাকে। ওদের আলোগুলো দেখতে পাচ্ছি অনেকটা পেছনে। মনে হল ওরা মাটিতে বিমান নামিয়ে নিচ্ছে আমাকেই খুঁজবার জন্য।

ওদের আলো যখন আর নজরে পড়ল না, তখন সাহস করে আমার টর্চবাতিটা জ্বালালাম কম্পাস দেখব বলে। সর্বনাশ, গোলার টুকরোর আঘাতে কম্পাস সম্পূর্ণ ভেঙে গেছে! তার মানে আমার আর কোনো পথ-প্রদর্শক রইল না। আমার স্পীড-দর্শক ঘড়িটাও ভেঙে চুরমার হয়েছে!

আকাশের তারা দেখে হয়তো মোটামুটি হেলিয়ামের দিক্‌টা বুঝে নিতে পারতাম। কিন্তু শহরটার সঠিক অবস্থান তো জানি না। কতটা বেগে চলেছি তাও এবার বুঝতে পারছি না, সুতরাং হেলিয়াম শহর খুঁজে পাব বলে মনে হয় না।

জোডাঙ্গা থেকে হেলিয়াম শহর প্রায় এক হাজার মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে। কম্পাস ঠিক থাকলে চার-পাঁচ ঘণ্টার মধ্যেই সেখানে পৌঁছোতে পারতাম। কিন্তু সকাল হতে দেখি একটা বিরাট সাগর-মরুর বিস্তীর্ণ এলাকার ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছি। অথচ তীব্রতম বেগে প্রায় ছ'ঘণ্টা ধরে উড়ে চলেছি এখন।

একটা বড় শহর নজরে পড়ল বটে, কিন্তু সেটা হেলিয়াম নয়।

কারণ আমি শুনেছি হেলিয়ামের চারপাশে বিরাট দুটো প্রাচীর আছে। তাহলে বোধহয় উত্তরদিকেই অনেকটা দূর চলে এসেছি ভেবে আমি বিমান ঘুরিয়ে নিলাম। সকালের দিকে আরো অনেক কটা শহর দেখলাম, কিন্তু কোনোটারই সঙ্গে হেলিয়ামের মিল নেই, যেমন বর্ণনা আমি কাণ্টোস্ কানের মুখে শুনেছি।

একুশ

॥ টার্স টারকাসের বন্ধুলাভ ॥

দুপুর নাগাদ প্রাচীন মঙ্গলের এক বিশাল নগরীর ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছি। নগরীর এলাকা পেরিয়ে সমতলভূমির খুব কাছ দিয়ে যাবার সময়ে নজরে পড়ল একটা ভয়ানক যুদ্ধ চলছে সবুজ জাতের দানবদের মধ্যে। ভালো করে বুঝে উঠবার আগেই আমার ওপর লক্ষ্য করে এক ঝাঁক গুলি ছুটে এল। ওদের টিপ বরাবরই অব্যর্থ। আমার ছোট বিমান পলকের মধ্যে ভেঙে চুরমার হল—পাক খেয়ে পড়তে লাগল মাটির দিকে।

লড়াইয়ের একেবারে মাঝখানটায় গিয়ে পড়েছি। সবুজ যোদ্ধারা এমন ভয়ংকর মরীয়া যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে আছে যে আমাকে কেউ নজরই করেনি। লম্বা তলোয়ার নিয়ে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করছে, আর যারা কখনো জটলা ছাড়িয়ে বাইরে গিয়ে পড়ছে তাদের ওপর তাক করে বন্দুক ছুঁড়ছে কেউ-কেউ। আমার বিমানখানা যখন ওদের মধ্যে গিয়ে পড়ল, জানি এবার আমায় মরণপণ লড়তেই হবে, নয়তো আমারও মৃত্যু! লম্বা তলোয়ারখানা এর মধ্যেই বের করে তৈরি হয়ে নিয়েছি।

যার পাশে গিয়ে প্রথম দাঁড়ালাম, প্রকাণ্ড দৈত্যের মতো চেহারা, তিনজন শত্রুর সঙ্গে একা লড়ছে। যুদ্ধের আলোর ঝলকানিতে তার ভয়ানক মুখখানা দেখেই চিনতে পারলাম—টার্স টারকাস্। আমি একটু পেছনে আছি বলে আমায় দেখতে পায়নি।...তিনটে শত্রু যে বারহুনের, তাও বুঝেছি। তারা একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ল টারকাসের ওপর। একটিকে তখুনি সাবাড় করে দিল শক্তিশালী টারকাস। কিন্তু পেছিয়ে আসতে গিয়ে টাল সামলাতে না পেরে পড়ল একটা মৃতদেহের ওপর।

বাকি দু'জন তড়িৎগতিতে টারকাসের ওপর হামলা করেছে। আমি যদি তক্ষুনি লাফিয়ে গিয়ে ওদের মধ্যে না পড়তাম তাহলে সে বোধহয়

এতক্ষণে প্রাণত্যাগ করত। দুটোর সঙ্গে লড়তে-লড়তে একজনের নিকেশ করেছি, এমন সময় থার্কের মহাযোদ্ধাও দাঁড়িয়ে পড়ে তিন নম্বরটাকে যমালয়ে পাঠাল।

আমার দিকে একবার তাকিয়ে টারকাস তার কঠিন ঠোঁটের ওপর মৃদু হাসির রেখা টেনে বললে :

—জন কার্টার, তোমায় তো চিনতেই পারিনি। কিন্তু বারসুমে এমন মানুষ আর কে আছে যে আমার জন্য এতটা করবে? বন্ধু, আমিও এতদিনে এইটুকু শিখেছি যে জীবনে বন্ধুত্ব বলে একটা জিনিস আছে!

আর বেশি কিছু বলল না সে, বলার সুযোগও নেই—কারণ তখন আমাদের দু'জনকেই চারদিক থেকে ঘিরে ফেলেছে বারহুন যোদ্ধার দল। কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে পাশাপাশি লড়ে চললাম দু'জন। লম্বা গরম দুপুরের রোদ যখন গড়িয়ে আসছে, যুদ্ধের মোড় যেন ঘুরে গেল। হিংস্র বারহুন দলের বাকি সেপাইরা তাদের থোটের পিঠে চড়ে একে একে চম্পট দিলে ঘনিয়ে-আসা অন্ধকারের মধ্যে। এ প্রচণ্ড যুদ্ধে দশ হাজার যোদ্ধা লড়েছে, হাজার তিনেক মৃতদেহ রণাঙ্গনেই ফেলে রেখে সরে পড়ল সবাই। না জয় পরাজয় কিছু হল, না কাউকে বন্দী করা হল।

শহরে ফিরে এসে সবাই চললাম টার্স টারকাসের আস্তানায়। যুদ্ধের পর অধিনায়কের সঙ্গে পরিষদের সভা বসে, এইটেই ওদের প্রথা। আমি একা রইলাম টারকাসের সঙ্গে। খানিকক্ষণ বসে অপেক্ষা করছি এমন সময় একটা বিশাল বিটকেল জানোয়ার এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার ওপর। আমাকে টেনে চিৎ করে ফেলে দিল মাটিতে। উলা! আমার বিশ্বাসী প্রভুভক্ত উলা। ও রাস্তা খুঁজে-খুঁজে ঠিক ফিরে এসেছিল থার্ক শহরে। পরে টারকাসের মুখে শুনেছি ফিরে এসেই নাকি আমার পুরনো আস্তানায় গিয়ে এতদিন একা-একা অপেক্ষা করেছে কবে আমি ফিরব সেই আশায়।

জেডাকের আবাসস্থল থেকে ফিরে এসে টার্স টারকাস আমায় বললে—জন কার্টার, তাল হাজুস্ জানে তুমি এখানে আছ। সারকোজা

আমাদের লড়াই থেকে ফিরতে দেখেছিল। তাল হাজুস আমায় হুকুম করেছে আজ রাতে তোমাকে তার দরবারে পেশ করতে।···আমি বলি কি, জন, আমার তো ছ'শটা থোট্ রয়েছে, তুমি এদের মধ্যে দরকার মতো বাছাই করে নাও। আমি তোমাকে হেলিয়ামে যাবার সবচেয়ে কাছের জলপথটা অবধি পৌঁছে দেব। টার্স টারকাস নিষ্ঠুর যোদ্ধা বটে, কিন্তু সত্যিকার বন্ধুও সে হতে পারে। চলো আমরা রওনা হই এখুনি।

—তুমি ফিরে এলে তোমার কী হবে টার্স টারকাস?

—হয়তো বুনো কুকুরদের মুখে, কিংবা আরো জঘন্য কিছু শাস্তি। যদি না একটা সুযোগ দেয় তাল হাজুসের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধের, যার জন্য আমি এতদিন অপেক্ষা করে আছি!

—না টার্স টারকাস। আজ রাতে তুমি এখানেই থাকবে, তাল হাজুসের সঙ্গে দেখাও করবে। নিজেকে অযথা বলি দেবার প্রয়োজন নেই—যা এতকাল চেয়েছ সে সুযোগটাও আজই রাতে হয়তো মিলবে।

টারকাস ঘোর আপত্তি জানালে। তাল হাজুস্ নাকি এখনও মাঝে-মাঝে আমার হাতে মার খাবার ঘটনাটা স্মরণ করে ভয়ানক খেপে ওঠে—একবার যদি আমাকে হাতে পায় তো চরম অত্যাচার করে মারবে।

খেতে বসে কথা বলতে বলতে টার্স টারকাস্‌কে শোনালাম সেই কাহিনী যা সোলা আমায় বলেছিল থার্ক যাত্রার সময়—সাগর মরুতে যে রাতে আমরা শিবির করেছিলাম।···টারকাস বিশেষ কিছু বললে না, কিন্তু তার মুখের পেশীগুলো আবেগ ও যন্ত্রণায় কঠিন হয়ে উঠল। তার ভয়াবহ নির্মম জীবনে একটিমাত্র প্রাণীকেই সে ভালোবাসতে পেরেছিল। সেই দুঃখী প্রাণীটার ওপর ভয়ংকর অত্যাচারের স্মৃতি তাকে বিহ্বল করে তুলেছে।

আমরা দু'জনে সারকোজাকে সরাসরি গিয়ে ধরব, আমার এ প্রস্তাবে সে আর আপত্তি করল না। তবে সে আগে কথা বলবে, তাও জানিয়ে দিল। সারকোজার আস্তানায় টারকাসের সঙ্গে আমিও গেলাম।

আমাকে দেখে সারকোজার চোখে সে কী বিষাক্ত ঘৃণা !

টার্স টারকাস তাকে বললে—সারকোজা, চল্লিশ বছর আগে গোজাভা নামে একটি মেয়েকে চরম অত্যাচার করে খুন করা হয়, আর সে হত্যার পেছনে ছিল তোমারই চক্রান্ত। সেই মেয়েটিকে যে সৈনিক-পুরুষ ভালবাসত সে বেশ জানে এ ব্যাপারে তোমার ভূমিকা ছিল কতখানি। এ খবর আমি সবেমাত্র পেয়েছি।···সে হয়তো তোমাকে মেরে ফেলবে না সারকোজা, কারণ আমাদের এ রকম রীতি নেই। কিন্তু তোমার গলায় দড়ির একটা ফাঁস দিয়ে আরেকটা দিক্ যদি কোনো বুনো থোটের সঙ্গে বেঁধে দেয়া যায় তাহলে তো আপত্তি থাকবে না, কারণ সে শুধু তোমার বেঁচে থাকার যোগ্যতা পরীক্ষা করে দেখবে।··· তা যা হোক্, কাল সে এই কাজ করবে জানতে পারলাম। তাই ভাবলাম তোমাকে সাবধান করে দেওয়াই ভাল, কারণ আমি ন্যায়বিচারের পক্ষপাতী। ইস্ নদীর তীর্থযাত্রা এমন কিছু দূরের যাত্রা তো নয় সারকোজা।···এসো জন কার্টার ! এবার আমরা চলি।

পরদিন ভোর থাকতেই সারকোজা চলে গিয়েছিল, আর কোনোদিন তাকে দেখাও যায়নি।

সে রাতে আমরা দুজন নীরবে এসে ঢুকলাম জেডাকের প্রাসাদে। সঙ্গে-সঙ্গে আমাদের হাজির করা হল তার সামনে। আসলে সে অধীর-ভাবে আমাদেরই প্রতীক্ষা করছিল। আমাকে দেখামাত্র তাল হাজুস্ সোজা হয়ে দাঁড়াল মঞ্চের ওপর, বড় বড় চোখে কটমট করে চেয়ে চেঁচিয়ে হুকুম দিলে—শয়তানটাকে থামের সঙ্গে বাঁধো ! দেখি কার এত সাহস যে শক্তিমান তাল হাজুসের গায়ে হাত তোলে ? লোহার শিক গরম কর। আমি নিজের হাতে ওর চোখ গেলে দেব, যাতে ভবিষ্যতে নোংরা দৃষ্টি দিয়ে আমার পবিত্র শরীর না দেখতে পায়।

তাল হাজুস্‌কে অগ্রাহ্য করে সমবেত নেতা মণ্ডলীর দিকে তাকিয়ে আমি চিৎকার করে বলে উঠি—থার্কের যোদ্ধা মহোদয়গণ। আমি তো আপনাদেরই মতো অধিনায়ক ছিলাম, এবং আজও আমি থার্কের শ্রেষ্ঠ

যোদ্ধার কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়েছি থার্কেরই জন্য। আপনারা নিশ্চয়ই আমার কথা বলার সুযোগটুকু কেড়ে নেবেন না। এটুকু অধিকার আজ আমি অর্জন করেছি। আপনারা তো ন্যায় বিচারে বিশ্বাসী···

—চোপ রও!—তাল হাজুস গর্জন করে ওঠে—জানোয়ারটার মুখ বাঁধো, যেমন হুকুম করেছি বেঁধে ফেল থামের সঙ্গে।

লোরকাস্ টোমেল এবার গলা উঁচিয়ে বললে—তাল হাজুস, ন্যায় বিচার। থার্ক দেশের এতকালের নিয়ম-কানুন ভেঙে দেবার তুমি কে? কী অধিকার তোমার?

প্রায় দশ বারেটি কণ্ঠস্বর এক সঙ্গে সায় দিয়ে বললে—নিশ্চয়। ন্যায় বিচার চাই!

তাল হাজুস্ প্রচণ্ড রাগে ফুঁসতে লাগল। আমি কিন্তু বলেই চললাম—আপনারা সাহসী জাতি, সাহস আপনাদের অতি প্রিয় গুণ। কিন্তু কোথায় ছিলেন আপনাদের মহাশক্তিধর জেডাক, যখন আজ লড়াই চলছিল? আমি তো তাঁকে যুদ্ধের আঙিনায় দেখিইনি। তিনি সেখানে যাননি। নিজের আস্তানায় বসে নারী ও শিশুদের তিনি দু'হাতে ছিঁড়ে ফেলেন, কিন্তু আপনারা কেউ ইদানিং তাঁকে দেখেছেন পুরুষদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে? এমন কি আমার মতো একটা বেঁটে বামনও সামান্য মুষ্টির ঘায়ে তার মতো দৈত্যকে কাত করে দিল?···এই সব প্রাণীকেই কি থার্কের যোদ্ধারা জেডাকের আসনে বসান? বরং এই দেখুন, আমারই পাশে এখানে রয়েছেন সত্যিকারের এক বীর থার্কবাসী, যেমন পাকা লড়িয়ে তেমনি মহৎ তার চরিত্র। নায়ক মহোদয়গণ, আপনারাই বলুন—টার্স টারকাস, থার্কদের জেডাক, শুনতে ভাল লাগে না?

সমস্বরে সায় দিয়ে উঠল অনেকগুলো গম্ভীর গলা।

আমি ফের বললাম—এখন শুধু আপনাদের নেতা-পরিষদের হুকুমের অপেক্ষা—তাল হাজুস্ শাসক হিসেবে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করুন। তিনি যদি সাহসী হন তাহলে টার্স টারকাসকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করুন। কিন্তু তাঁর সে সাহস নেই। আপনাদের জেডাক তাল হাজুস্ ভীরু কাপুরুষ! আমি আমার ফাঁকা হাতেই তাঁকে মেরে ফেলতে পারি,

এ-কথা তিনিও জানেন।

আমি চুপ করতে চারদিকে একটা দুঃসহ নিস্তব্ধতা, প্রত্যেকটি চোখ তাল হাজুসের দিকে নিবদ্ধ। সে কথাও বলছে না, নড়ছেও না। শুধু তার বিবর্ণ সবুজ মুখখানা কাল্‌চে মেরে গেছে, ঠোঁটের দু'কোণে জমেছে ফেনা।

শীতল কঠিন কণ্ঠে লোরকাস টোমেল বললে—তাল হাজুস্‌, আমার দীর্ঘ জীবনকালের মধ্যে থার্কদের কোনো জেডাককে এমন হীনভাবে অপমানিত হতে দেখিনি। এ অপমানের শুধু একটাই জবাব হতে পারে। আমরা তারই প্রতীক্ষা করছি।

তবু তাল হাজুস্‌ পাথর বনে যাওয়ার মতো ঠায় দাঁড়িয়ে রইল।

লোরকাস্‌ টোমেল আবার বললে—অধিনায়কগণ! জেডাক তাল হাজুস্ কি প্রমাণ দেবেন যে তিনি টার্স টারকাসের নেতা হবার যোগ্য?

মঞ্চ ঘিরে দাঁড়িয়েছিল কুড়িজন অধিনায়ক—কুড়িখানা তলোয়ার শূন্যে উঠল প্রস্তাবে সম্মতি জানিয়ে। আর কোনো উপায় রইল না। এ হল পরিষদের অন্তিম হুকুমনামা। অগত্যা তাল হাজুস লম্বা তলোয়ার বের করে এগিয়ে গেল টার্স টারকাসের মোকাবিলা করতে।...

স্বল্পকালের মধ্যে দ্বন্দ্বের নিষ্পত্তি। মৃত দানবের গলার ওপর পা রেখে টার্স টারকাস্‌ নিজেকে ঘোষণা করল থার্কদের জেডাক বলে। অতি সংক্ষেপেই সব শেষ হল।

নতুন জেডাকের প্রথম কাজ হল আমাকে অধিনায়কের পূর্ণ পদমর্যাদা দেওয়া—আমার সৈনিকদলের মধ্যে রইল তারা যাদের আমি বন্দী জীবনের প্রথম ক'হপ্তার মধ্যে নিজের আওতায় এনেছিলাম দ্বন্দ্বযুদ্ধের মারফত। আমার প্রতি ওদের আনুগত্য লক্ষ্য করে ওদের সহায়তা চাইলাম জোডাঙ্গাকে শায়েস্তা করতে; টার্স টারকাসকে আমার সমস্ত অভিযানের কাহিনী খুলে বললাম, তারপরে অল্প কথায় আমার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা হল।

পরে পরিষদের সদস্যদের বোঝাল টার্স টারকাস—জন কার্টারের একটা প্রস্তাব রয়েছে এতে আমারও সম্মতি আছে। আপনাদের

সংক্ষেপে বলি। হেলিয়ামের রাজকুমারী দেজা থোরিস, যে আমাদের কাছে বন্দিনী ছিল, তাকে জোডাঙ্গার জেডাক আটক করে রেখেছে। জোডাঙ্গার সেনাবাহিনী হেলিয়াম শহর অবরোধ করে বসে আছে। ধ্বংসের হাত থেকে হেলিয়াম প্রজাদের বাঁচাবার জন্য রাজকুমারী বাধ্য হচ্ছে জোডাঙ্গার জেডাকের ছেলেকে বিয়ে করতে।...জন কার্টারের প্রস্তাব রাজকুমারীকে আমরা উদ্ধার করে হেলিয়াম রাজ্যে ফিরিয়ে দিই। জোডাঙ্গার অঢেল সম্পদ লুঠ করা মন্দ হবে না সেটুকু বলে রাখছি! এখন আপনাদের কী মত?

একটা যুদ্ধের সুযোগ, তার ওপর এন্তার লুঠ! টোপ গিলতে কারুরই আপত্তি হল না। আনন্দে আত্মহারা হল সবাই। আধঘণ্টার মধ্যে সাগর মরুর দিকে দিকে থোট-আরোহী সেপাইরা ছুটে গেল বিভিন্ন গোষ্ঠীদলকে ডেকে জড়ো করতে। জোডাঙ্গায় অভিযান হবে!

তিন দিনের মধ্যে শুরু হল জোডাঙ্গা যাত্রা। অভিযানে এক লাখ সেনা শামিল হয়েছে। টার্স টারকাস জোডাঙ্গায় বড়ো আকারের লুঠ হবে ভরসা দিয়ে সবুজ যোদ্ধাদের তিনটে ছোট উপজাতিকে দলে টেনেছে।...সৈন্যসারির সামনে চলেছি আমি, টারকাসের পাশাপাশি। আমার থোটের পেছন পেছন আসছে আমার আদরের উলা।

শুধু রাতের বেলায় পথ চলি আমরা। দিনের বেলা এমন ব্যবস্থা যে যথাসময়ে কোনো বড় পরিত্যক্ত পুরনো শহরে শিবির গাড়ি। জানোয়ারগুলোকে অবধি চোখের আড়ালে লুকিয়ে রাখা হয় দিনমানে। যাত্রাপথে টার্স টারকাস নানা কূটনীতির কৌশল চালিয়ে আরো প্রায় পঞ্চাশ হাজার সেনা জোগাড় করে ফেলেছে অন্য সব সবুজ উপজাতির ভেতর থেকে!

দশদিন পর এক মধ্যরাতে জোডাঙ্গা শহরের দেয়ালের বাইরে এসে থামল দেড় লক্ষ যোদ্ধা। টারকাসের মতে, বারসুমের ইতিহাসে সবুজ জাতের এত বড় সেনাদল কখনো কোনো যুদ্ধযাত্রার শামিল হয় নি। এদের মধ্যে শান্তি বজায় রেখে সুশৃঙ্খলভাবে চালানো ভয়ানক কঠিন কাজ অথচ টার্স টারকাস অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে সে কাজ করছে।

জোড়াঙ্গার কাছাকাছি আসতে আসন্ন লড়াই আর লুণ্ঠনের লোভে ওরা তো ছোটখাটো ঝগড়া বিবাদ ভুলেই গেল। লাল জাতের ওপর, বিশেষ করে জোড়াঙ্গীদের ওপর ওদের অনেক দিনের রাগ ওদের স্ফুটনাগারের ডিম নষ্ট করে ফেলে বলে।

জোড়াঙ্গার প্রাচীরের কাছে এসে আমার ওপর ভার পড়ল শহরে প্রবেশ করার রাস্তা বের করার। সেনাবাহিনী ছুটো ভাগ করে একেক ভাগ রইল শহরের ছুটো প্রধান ফটকের সামনে টারকাসের হেপাজতে। আমি কুড়ি হাজার সেপাইকে পায়দল চালিয়ে বিশাল প্রাচীরের সামনে দাঁড়ালাম। পঁচাত্তর ফুট উঁচু দেয়াল, আগাগোড়া বিশেষ ধাতু দিয়ে গড়া। সবুজ সেনারা তো ভেবেই পেল না এ পাঁচিলের ওপরে ওঠা কী ভাবে সম্ভব।

আমি সেপাইদের ছোট-ছোট দলে ভাগ করে দেয়ালের সামনে মাথা গুজে পিরামিড হতে বললাম। ওদের কাঁধের ওপর চড়ল কিছু সেপাই, তারও ওপরে কয়েকজন। পর-পর এই রকম কয়েকটা পিরামিড, সব ওপরের সেপাইদের মাথা প্রায় চল্লিশ ফুট উঁচুতে। একটু পেছিয়ে এসে আমি দৌড়ে চড়ে গেলাম একেকটা দলের ঘাড়ের ওপর দিয়ে, সিঁড়ির মতো। সব থেকে উঁচু বৃষস্কন্ধ যোদ্ধাটার কাঁধের ওপর থেকে একটা লাফ মেরেই চড়ে বসলাম প্রাচীরের মাথায়।

সঙ্গে একটা চামড়ার লম্বা দড়ি এনেছিলাম—সেটা ঝুলিয়ে দিলাম প্রাচীর ওপাশে। তারপর দড়ি বেয়ে নেমে পড়লাম ভেতরে। কান্টোস কানের কাছে আগেই শুনেছিলাম ওদের শহরের ফটক খোলার কায়দা। তাই কয়েক মিনিটের মধ্যে কুড়ি জন বাছা-বাছা সেপাইকে গেটের ভেতরে নিয়ে আসতে কষ্ট হল না। জোড়াঙ্গার ভাগ্যতারা এবার ডুবল।

প্রাসাদ-প্রাঙ্গণের বাইরের ছোট দেয়ালের সামনেই আমরা সরাসরি এসে পড়েছি দেখে খুশি হলাম। দূর থেকে প্রাসাদ দেখা যাচ্ছে আলোয় ঝলমল। ঠিক করলাম একদল সৈন্য নিয়ে প্রাসাদেই হামলা করব আমি। এর মধ্যে বাকি সেপাইরা লাল সৈন্যদের ছাউনি
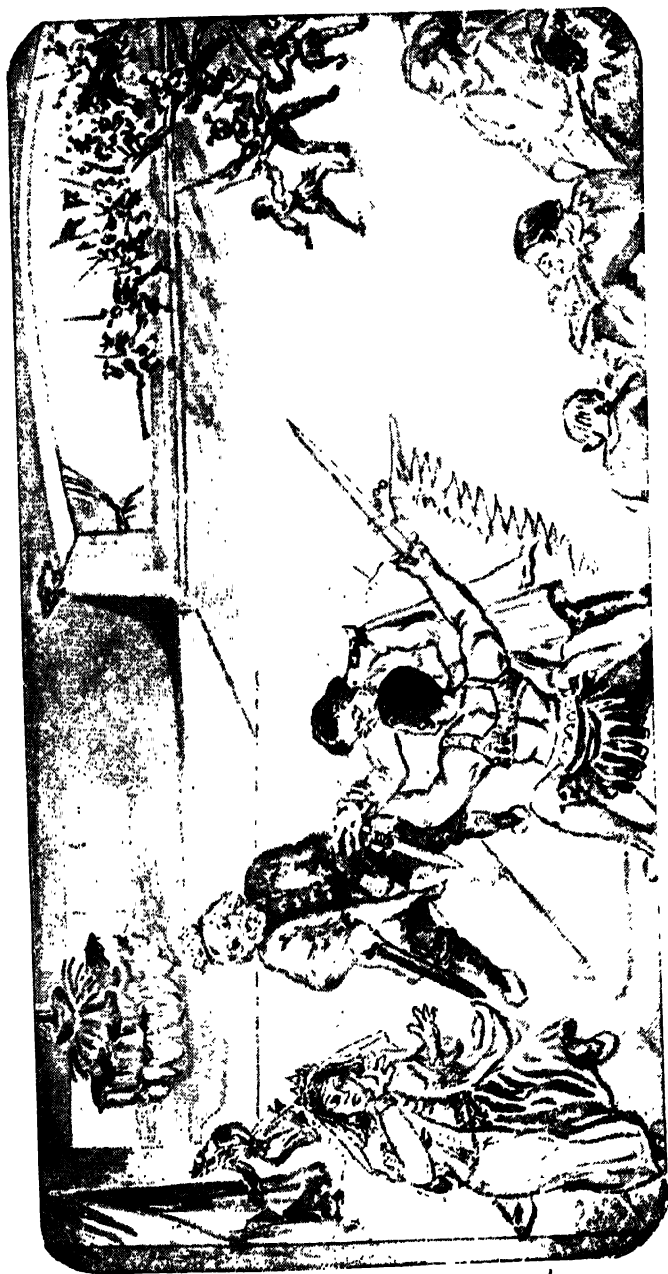
সাঁড়াশির মতো চেপে ধরলাম ওর হাতের কব্জি। ... তরোয়াল উঁচু করে কক্ষের অপর প্রান্তের দিকে দেখিয়ে চেঁচিয়ে বললাম—খবরদার' জোতাঙ্গার পতন হয়েছে। ওই দ্যাখ চেয়ে' ... পৃ.১৩২

আক্রমণ করেছে।

সেপাই মারফত টারকাসের কাছে খবর পাঠিয়ে পঞ্চাশ জন অতিরিক্ত সৈন্যকে ভেতরে আনিয়ে নিলাম! প্রাসাদের একটা ফটক দখল করে দ্বিতীয় দরজাটার ভার নিলাম আমি নিজেই। আমাদের সব কাজই হল মতলব মাফিক। প্রথমে দুটো শান্ত্রীকে চুপিসাড়ে যমালয়ে পাঠিয়ে, একে একে সব কটা প্রহরীকে নিধন করা হল, দুটো ফটকেরই।

বাইশ

॥ জোডাঙ্গা লুঠ ॥

আমার সামনের বড় ফটকটা খুলে গেল। আমার সঙ্গী পঞ্চাশ জন থার্ক। টার্স টারকাস নিজে এসেছে এবার নেতৃত্ব দিতে। ওরা বিশাল থোটগুলোর পিঠেই চেপে এসেছে সব কজন। প্রাসাদের বাগানের প্রাচীরটা আমি নিজেই টপকে ভিতরে ঢুকে গেলাম অনায়াসে। প্রাচীরের দরজা খুলতে প্রথমে একটু বেগ পেতে হলেও শেষ অবধি ভারি কব্জাগুলো হার মানল। দরজা খুলে দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে টার্স টারকাস সদলে থোটে নিয়ে ঢুকে পড়ল জোডাঙ্গা-নায়কের প্রশস্ত বাগানের মধ্যে।

প্রাসাদের বড় বড় জানলা দিয়ে পরিষ্কার দেখতে পেলাম জেডাক থান কোসিসের সভাকক্ষ, উজ্জ্বল আলোয় ঝলমল করছে। প্রকাণ্ড হল-কামরাটায় ভিড় করে আছে অমাত্য পুরুষেরা, তাদের পরিবারের মহিলাবৃন্দ। তার মানে কোনো বড় গোছের অনুষ্ঠান চলছে ভেতরে। প্রাসাদের প্রবেশপথে কোনো প্রহরী নেই, বোধহয় প্রয়োজন বোধ করেনি প্রহরী রাখার—শহর আর প্রাসাদের প্রাচীরগুলো তো দুর্ভেদ্য।

আমি আরো কাছে এসে ভেতরে উঁকি দিই। কক্ষের এক দিকে দুটো বহুমূল্য হীরা-বসানো সোনার সিংহাসনে বসে আছেন থান কোসিস আর তার রানী। আশে-পাশে সামরিক কর্মচারীরা, সরকারী হোমরা-চোমরার দল। ওদের সামনে দু'সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে সুসজ্জিত সৈনিক, মাঝে একটা চওড়া পথ রেখেছে আসা-যাওয়ার।

এই পথের অপর প্রান্তে কক্ষের দরজা হঠাৎ খুলে গেল। দেখলাম একটা শোভাযাত্রার সম্মুখভাগ ধীরে ধীরে ঢুকছে। শোভাযাত্রা এগিয়ে এল সিংহাসনের সামনে। প্রথমে চারজন রক্ষী-অফিসার, তাদের হাতে একটা প্রকাণ্ড থালা, তাতে লাল মখমলের গদির ওপর একটা সোনার শেকল। শেকলের দুটি প্রান্তে সোনার গলাবন্ধ;

হু'জোড়া তালাও আছে। ওদের ঠিক পেছনে আরেকটা থালা হাতে নিয়ে এল চারজন, সে থালার ওপর রয়েছে জোডাঙ্গা রাজপরিবারের বহুমূল্য অপরূপ অলঙ্কার।

ওদের হু'দল সিংহাসন মঞ্চের নিচে স্থির হয়ে দাঁড়াতেই শোভাযাত্রার বাকি অংশ এগিয়ে এল—পাত্রমিত্র অমাত্যদের দল, তারপর একেবারে শেষে এল হুটি মূর্তি, আগাগোড়া রেশমের কাপড়ে মোড়া। তাদের শরীরের কোনো অংশ দেখা যাচ্ছে না। থান কোসিসের সিংহাসনের সামনে দাঁড়াল হুজন।

থান কোসিস নিচু গলায় তাদের কিছু বললেন, যা আমি এখান থেকে শুনতে পেলাম না। তারপর হুজন অমাত্য এগিয়ে এসে ওদের একজনের দেহ থেকে রেশমের আঙরাখা খুলে নিলে। সাব থান্! সামনেই দাঁড়িয়ে আছে জোডাঙ্গার যুবরাজ!

কান্টোস্ কান তার কাজ করতে ব্যর্থ হয়েছে বুঝলাম।

থান কোসিস এবার হাত বাড়িয়ে থালার ওপর থেকে সোনার গলাবন্ধনীটা নিয়ে ছেলের গলায় পরিয়ে দিয়ে তালাচাবি এঁটে দিলেন। তারপর সাব থানকে হু'চারটে কথা বলে মুখ ফেরালেন অপর মূর্তির দিকে। অমাত্যরা তারও মুখের ওপর থেকে রেশমের ঘোমটা সরিয়ে দিয়েছে। দেজা থোরিস, হেলিয়ামের রাজকন্যা।

অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য তো বুঝতেই পেরে গেছি। আর খানিক বাদেই দেজা থোরিস চির জীবনের মতো সাব থানের সঙ্গিনী হতে চলেছে। ওদের বিয়ের অনুষ্ঠান হয়তো সুন্দর, হয়তো মনোরম, কিন্তু আমার কাছে মনে হল দানবীয়।

থান কোসিসের হাতে সোনার শেকলের অন্য প্রান্ত। গলাবন্ধনীটা তিনি সবে খুলেছেন, আমি আমার হাতের তরোয়াল মাথার ওপর উঁচিয়ে ভারি বাঁটখানা দিয়ে প্রচণ্ড এক ঘা কষি সামনের জানলার কাঁচে। কাঁচ ভেঙে খান্ খান্ হয়ে যায়। এক লাফে এসে পড়ি সমবেত বিস্মিত জনতার সামনে!

থান কোসিসের মঞ্চের ওপর তড়াক করে লাফিয়ে উঠে তরোয়াল

দিয়ে ছিনিয়ে নিলাম সোনার শেকলটা। থান কোসিস অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন আমার দিকে।

পলকের মধ্যে সব কিছু বিপর্যস্ত। চারদিক থেকে হাজারটা তরোয়াল উঁচু হয়ে উঠল। সাব থান একটা রত্নখচিত ছোরা হাতে ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার ওপর। আমি তখন ওকে মাছির মতো টিপে মারতে পারতাম, কিন্তু বাধা হয়ে দাঁড়াল ওদের পুরনো বারসুমী প্রথা। দেজাকে পেতে হলে একে মারা চলবে না নিজের হাতে। আমি সাঁড়াশির মতো চেপে ধরলাম ওর হাতের কব্জি। আরেক হাতে তরোয়াল উঁচু করে কক্ষের অপর প্রান্তের দিকে দেখিয়ে চেঁচিয়ে বললাম—খবরদার! জোডাঙ্গার পতন হয়েছে। ওই ছাখো চেয়ে!

সবারই চোখ ঘুরে গেল পেছনের দিকে। প্রবেশ পথের মস্ত চৌকাঠ ডিঙিয়ে টার্স টারকাস তখন ঢুকছে পঞ্চাশজন থোট-সওয়ারী সেপাই নিয়ে। জোডাঙ্গার সৈনিক, অমাত্য, রক্ষীরা সবাই ছুটে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল থার্কদের ওপর। সাব থানকে এক ঠেলা দিয়ে মঞ্চ থেকে ফেলে দিয়ে আমি দেজা থোরিসকে পাশে টেনে নিলাম।···সিংহাসনের পেছনে একটা সরু গলি আর ছোট দরজা। থান কোসিস খোলা তরোয়াল হাতে দাঁড়িয়ে আছেন আমার অপেক্ষায়। মুহূর্তের মধ্যে শুরু হল আমাদের দ্বন্দ্বযুদ্ধ। দেখলাম তাঁর লড়াইয়ের হাত আছে।

বড় মঞ্চটা ঘুরে-ঘুরে লড়ছি আমরা, এর মধ্যে সাব থান মঞ্চের সিঁড়ি দিয়ে উঠে এল বাপের পাশে। যেই ও হাত তুলেছে আমাকে আঘাত করতে, দেজা থোরিস লাফিয়ে পড়ল মাঝখানে। সেই ফাঁকে আমি তরোয়াল বসিয়ে দিলাম থান কোসিসের বুকে। পিতৃহীন সাব থান এক মুহূর্তেই হয়ে গেল জোডাঙ্গার জেডাক।

মেঝের ওপর থান কোসিসের দেহ গড়িয়ে পড়তে, দেজা থোরিসের হাত ছাড়িয়ে সাব থান ছুটে এল আবার। ফের শুরু হল মুখোমুখি লড়াই। ওর পক্ষের আরো চারজন তখন যোগ দিয়েছে ওকে বাঁচাতে। একটা সিংহাসনের ওপর কাত হয়ে পড়ে তরোয়াল চালাতে মুশকিল হচ্ছিল—আঘাত করতে পারব না অথচ নিজেকে বাঁচাতে হবে।

বিজলির গতিতে আমার তরোয়াল মাথার ওপর দিয়ে ঘুরছে। সাব থানের একেকটা আঘাত ঠেকিয়ে যেতে হচ্ছে। ওর সঙ্গীদের দুটিকে আমি শায়েস্তা করেছি। আরো নতুন লোক ছুটে আসতে লাগল নতুন জেডাকের প্রাণ বাঁচাতে। ওরা তখন চেঁচাচ্ছে—ওই মেয়েমানুষটা! ওটাকে মারো! ওরই চক্রান্ত সব। দেজা থোরিসকে পেছনে টেনে নিয়ে সরু গলিটার দিকে যাবার জোগাড় করেছি। আমার মতলব বুঝতে পেরে ওদের তিনজন আগেই ছুটে গিয়ে পথ রুখে দাঁড়াল। থার্করা ওদিকে এত ব্যস্ত যে ভাগ্যের হাতে নিজেদের সঁপে দিয়েছি তখন।

তারপরেই দেখি বিশাল দৈত্যের মতো এগিয়ে আসছে টার্স টারকাস—আশপাশের যোদ্ধাগুলোকে ওর কাছে দেখাচ্ছে ছোট পিগমির মতো। তরোয়ালের একেকটা আঘাতে দশ-বারোজনকে ধরাশায়ী করছে। পথ কেটে এগিয়ে এল মঞ্চের ওপর আমার পাশে।

জোডাঙ্গীরা প্রচুর বীরত্ব দেখিয়েও এক-এক করে সবাই সাবাড় হয়ে গেল। তবু কিন্তু তারা জায়গা ছেড়ে পালিয়ে যায়নি। যা হোক, এখন শুধু থার্করাই রয়েছে যুদ্ধস্থলে—আর রয়েছি দেজা থোরিস ও আমি। সাব থান মরে পড়ে আছে তার বাপের পাশে।

যুদ্ধ শেষ হতে আমার প্রথম চিন্তা হল কান্টোস কানকে খুঁজে বের করতে হবে। টারকাসের কাছে দেজাকে ছেড়ে ছুটে গেলাম প্রাসাদের নিচের কারাকক্ষের দিকে। কারারক্ষীরা সবাই লড়তে চলে গিয়েছিল রাজসভায়। তাই এখানে সব শূন্য। কান্টোস কানের নাম ধরে ডাকতে এক কোণ থেকে একটা ক্ষীণ আওয়াজ এল। সেদিকে লক্ষ্য করে এগিয়ে যেতে দেখি একটি অন্ধকার কুঠরিতে অসহায় অবস্থায় বসে রয়েছে কান্টোস কান। আমাকে দেখে সে কী উল্লাস তার! এক-এক করে সব ঘটনাই বলল সে! প্রাসাদের গম্বুজের ছাদে উঠে আসার আগেই ধরা পড়েছিল সে, সাব থানের মুখও দেখতে পায়নি। ওকে নিয়ে চলে এলাম রাজসভার কক্ষে।

শহরে তখন জোর লড়াই চলছে। বন্দুকের আওয়াজ আর চিৎকার

ভেসে আসছে রাস্তা থেকে। টারকাস্ চলল ওদের লড়াই চালনা করতে। কান্টোস কান ওকে রাস্তাঘাট চেনাবার জন্য সঙ্গে চলে গেল। শুধু আমি আর দেজা থোরিস রয়ে গেলাম সভাকক্ষে।

একটা সিংহাসনের ওপর ক্লান্ত দেহ এলিয়ে দিয়ে মিষ্টি হেসে দেজা থোরিস বললে—এমন মানুষ কখনো দেখিনি! ক'টি মাসের মধ্যে যা আমরা কোনোদিনও করতে পারিনি তাই করেছ তুমি—লাল মানুষদের সঙ্গে বুনো সবুজ দানবগুলোকে মিলিয়েছ।

আমি বললাম—কী আর এমন কঠিন কাজ। তুমি পাশে থাকলে এ তো কিছুই নয়!

দেজা বললে—এবার তো পাশে থাকবই। আমি এখন মুক্ত!

তেইশ

॥ শত্রু নিধন থেকে বিজয়োৎসব ॥

শহর থেকে খবর নিয়ে এসেছে টার্স টারকাস আর কান্টোস কান। জোডাঙ্গা সম্পূর্ণ পরাজিত, এখন আমাদের পুরো দখলে। কিছু বিমান পালিয়ে গেলেও ওদের সেনাবাহিনী সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়েছে। বহু বিমান এখন থার্ক যোদ্ধাদের হাতে, ওদেরই পাহারায় আছে।

আমরা ঠিক করলাম কিছু বাছা সেপাই আর বিমান নিয়ে হেলিয়ামের দিকে রওনা হয়ে যাব—আর দেরি করার প্রয়োজন নেই। জোডাঙ্গা শহর রইল সবুজ উপজাতিগুলোর হাতে যতদিন না ওদের লুঠের নেশা মেটে।

বিমান বন্দরের ছাদ থেকে পাঁচ ঘণ্টা বাদে আমাদের আড়াইশো বড়ো উড়োজাহাজ আকাশে উঠল প্রায় লাখ খানেক সবুজ যোদ্ধা নিয়ে। পেছন পেছন মালবাহী উড়োজাহাজে আমাদের খোটগুলো আসছে।

প্রায় দুপুর নাগাদ দূর থেকে আমরা দেখতে পেলাম হেলিয়াম শহরের হলদে আর লাল প্রাসাদ চুড়োগুলো।

এদিকে জোডাঙ্গার যে বিরাট বাহিনী এতদিন হেলিয়াম শহরকে অবরোধ করে চারদিক ঘিরে শিবির গেড়ে বসে রয়েছে, তারা অচিরেই টের পেয়ে গেল যে আমরা এগিয়ে আসছি। তাদের উড়োজাহাজগুলো আকাশে উঠে ধেয়ে আসতে লাগল আমাদের দিকে। সবুজ থার্ক বাহিনীও সঙ্গে সঙ্গে তাদের ওপর গোলাবর্ষণ করতে শুরু করল। ঝাঁকে ঝাঁকে গোলা ছুঁড়ে নাস্তানাবুদ করল তাদের উড়োজাহাজ বাহিনীকে।

ওদিকে হেলিয়ামের রক্ষাফৌজ যখন বুঝতে পারল আমরা তো আসলে ওদেরই মিত্র, তখন আমাদের সহায়তায় ওরা শ'য়ে শ'য়ে বিমান পাঠাতে লাগল। একটা বড়ো রকমের বিমান যুদ্ধ শুরু হল এবার। প্রথম প্রথম দু'পক্ষ প্রায় একই উচ্চতায় চক্কোর কাটলে। পাশাপাশি দাঁড়িয়ে গোলা ছুঁড়তে ছুঁড়তে আচমকা জোডাঙ্গীদের একটা বড়ো

উড়োজাহাজ চৌচির হয়ে ফেটে পড়ল। তার নাবিকরা হাজার ফুট ওপর থেকে শূন্যে ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগল।

এবার হেলিয়াম বিমানগুলো দ্বিগুণ উৎসাহে হামলা করছে জোডাঙ্গী বিমানবাহিনীর ওপর। তারা সুযোগ পেয়ে আকাশের ওপরের অংশ দখল করেছে; আবার এদিকে অগুনতি ছোট-ছোট এক-সওয়ারী বিমান নিচে থেকে ঘিরে ধরল জোডাঙ্গী উড়োজাহাজগুলোকে। ওপরের হেলিয়াম বিমানগুলো থেকে টপ্ টপ্ করে সৈন্য নামতে লাগল জোডাঙ্গী উড়োজাহাজের ডেকের ওপর। প্রায় ঘণ্টাখানেক এমনিভাবে চলবার পর ওদের আর আত্মসমর্পণ করা ছাড়া গত্যন্তর রইল না।

ওদের জাহাজের আত্মসমর্পণের দৃশ্যটা বড় করুণ। মঙ্গলের পুরনো প্রথা অনুসারে আত্মসমর্পণের চিহ্ন হিসাবে প্রত্যেক পরাজিত উড়োজাহাজের অধিনায়ককে শূন্য থেকে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে মাটিতে। সাহসী জোডাঙ্গী যোদ্ধারা এক-এক করে তাই হাতে দেশের পতাকা নিয়ে জাহাজ ছেড়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগল মৃত্যু বরণ করবার জন্য। যতক্ষণ না প্রত্যেকটি অধিনায়ক এই মৃত্যু-ঝাঁপ শেষ করলে ততক্ষণ লড়াই শেষ হল না। এই নিরর্থক আত্মবলিদান শেষ হলে তবে ওদের বিমানযুদ্ধ খতম হল।

আমরা এবার হেলিয়াম উড়োজাহাজ বাহিনীর প্রধান জাহাজকে সংকেত করে জানালাম এগিয়ে আসার জন্য। জাহাজটা আমাদের কাছাকাছি আসতে আমি চিৎকার করে বললাম, রাজকুমারী দেজা থোরিস আমাদের জাহাজে রয়েছেন—আমরা তাঁকে প্রধান জাহাজে উঠিয়ে দিতে চাই যাতে তিনি শহরে যেতে পারেন।

এ সংবাদে ওদের জাহাজে যেন হৈ-হৈ পড়ে গেল। ওদের ওপরের ডেকগুলোতে রাজকুমারীর নিজস্ব বংশ-পতাকা উড়ল একের পর এক। অন্য জাহাজগুলোও তাই দেখে তুমুল আনন্দে নিজেদের জাহাজে ঝাণ্ডা ওড়ালো। প্রধান জাহাজ এবার ধীরে ধীরে আমাদের জাহাজের পাশে এসে গা ঠেকিয়ে দাঁড়াতেই দশ-বারোজন কর্মকর্তা লাফ দিয়ে চলে এল আমাদের ডেকে। প্রথমে তো ওরা হকচকিয়ে থ' মেরে দাঁড়িয়ে

—আপনারা সবাই জন কার্টারকে অভিবাদন জানান—আমাকে দেখিয়ে দেজা থোরিস্ বললে—তাঁর কাছেই ... আজ হেলিয়াম ঋণী তাদের রাজকন্যাকে ফিরে পাবার জন্যে। .. পৃ.১৩৭

পড়ল আমাদের সবুজ যোদ্ধাদের দেখে। এটা ওদের অপ্রত্যাশিত। কিন্তু পরে কান্টোস কানের ওপর নজর পড়তে সবাই এগিয়ে এসে তাকে ঘিরে দাঁড়াল।

দেজা থোরিস আর আমি সামনে আসতে এবার ওদের দৃষ্টি শুধু আমাদের ওপর—আর কারুর দিকে ওদের নজরই নেই। দেজা ওদের সবাইকে সস্মিত বদনে আপ্যায়ন করে প্রত্যেককে নাম ধরে ধরে জিজ্ঞেস করলে কে কেমন আছে। দেজার পিতামহের বড়ো বড়ো অমাত্য এঁরা, সবাইকেই সে ব্যক্তিগতভাবে চেনে।

—আপনারা সবাই জন কার্টারকে অভিবাদন জানান!—আমাকে দেখিয়ে দেজা থোরিস বললে—এঁর কাছেই আজ হেলিয়াম ঋণী তার রাজকন্যাকে ফিরে পাবার জন্য, আজকে আমাদের বিজয়ের মূলেও রয়েছেন ইনি।

ওঁরা সবাই আমার সুখ্যাতি করে বিশেষ সমাদর দেখালেন। কিন্তু যে বিষয় ওঁরা সবচেয়ে বেশি মুগ্ধ হয়েছেন তা হল দেজা থোরিসের মুক্তি আর হেলিয়ামের সংকটমোচনে আমি যেভাবে এতকালের দুর্ধর্ষ থার্কদের বশ করেছি, বন্ধু বানিয়ে নিয়েছি। আমি বললাম—কিন্তু আপনাদের ধন্যবাদ যাঁর বেশি প্রাপ্য তিনি হলেন থার্কদের জেডাক এই টার্স টারকাস, বারসুমের এক শ্রেষ্ঠ বীর ও নেতা, এঁর সঙ্গে মিলুন আপনারা!

ওঁরা যে পূর্ণ সম্ভ্রম দিয়ে টারকাসকে সমাদর জানালেন তাই নয়, আমি অবাক হয়ে দেখলাম টারকাসও সমান আভিজাত্যের সঙ্গে ওদের সঙ্গে ব্যবহার ও কথাবার্তা বলছে।

দেজা থোরিস এর মধ্যে প্রধান জাহাজে উঠেছে। আমি তার সঙ্গে এখুনি যাচ্ছি না দেখে নিরুৎসাহ হল কিন্তু যুদ্ধজয়ের এখনো তো খানিকটা বাকি রয়েছে। জোডাঙ্গীদের বিরাট স্থলসেনা বাহিনী এখনো শহর ঘিরে রয়েছে। টার্স টারকাসকে একা ফেলে যাব কেমন করে? তাই জাহাজদুটো আলাদা করে দেজা থোরিস একাই বিজয়গৌরবে উড়ে চলে গেল তার পিতামহ তার্দোস মর্সের দরবারে।

দূরে আমাদের মালবাহী বিমানগুলো অপেক্ষা করছে সবুজ

সৈন্যদের খোট নামাতে হবে। শহর থেকে দশ মাইল দূরে এক জায়গায় বিমানগুলো খালাস করা হল। দড়ি দিয়ে বেঁধে একেক করে সব জানোয়ার নামানো হল মাটিতে। তারপর টার্স টারকাসের হুকুমে অভিযান শুরু হল। ফৌজ তিনভাগে ভাগ করে প্রত্যেক সারি আলাদা আলাদা এগোতে লাগল জোডাঙ্গী শিবির লক্ষ্য করে। ওদের মূল শিবিরের মাইলখানেক দূরে এসে শুরু হল আমাদের প্রচণ্ড আক্রমণ। ওরা আগে থাকতে তৈরিই ছিল খানিকটা। তাই আমাদের বিশেষ বেগ পেতে হল। বার বার মার খেয়ে পেছু-পা হতে হল আমাদের। এই রকম চলল দুপুর অবধি। হেলিয়াম থেকে কোনো ফৌজ এখন অবধি এসে পৌঁছলো না, এত ঘণ্টা অবধি তাদের কোনো খবরও আসেনি। হেরে যাব বলেই মনে হচ্ছে আমার।

হঠাৎ বিকেলের দিকে জোডাঙ্গা শিবিরের অপর দিকটা থেকে প্রচণ্ড গোলাবর্ষণের আওয়াজ আসতে শুরু করেছে—তার মানে বোধহয় হেলিয়ামের দিক থেকে আক্রমণ চালু হল এবার। টার্স টারকাস হুকুম দিলে এইবার পুরোদমে হামলা কর জোডাঙ্গা বাহিনীর ওপর। দু'দিক থেকে ক্রমাগত চাপের মধ্যে জোডাঙ্গীদের অবস্থা কাহিল হল। একদিকে থার্কদের নতুন উৎসাহে আক্রমণ, অন্যদিকে হেলিয়ামের তাজা ফৌজ, মাঝখানে জাঁতাকলের মধ্যে পড়েছে তারা। যুদ্ধ আর বেশিক্ষণ চলল না। দলে-দলে বন্দী হল। ময়দানের ধ্বংস যজ্ঞ পার হয়ে আমাদের বাহিনী বিজয় গৌরবে প্রবেশ করল হেলিয়ামের তোরণদ্বারে।

অগণিত উল্লসিত জনতার মাঝখান দিয়ে হেলিয়ামের চওড়া রাস্তা ধরে আমাদের মিছিল চলেছে। অভিনন্দন, হাততালি আর অলঙ্কার বর্ষণের মধ্যে আমরা যেন এক আনন্দ-উন্মত্ত শহরের মধ্যে এসে পড়েছি। সবচেয়ে উত্তেজনা আর উৎসাহের সৃষ্টি করেছে আমাদের দুর্ধর্ষ থার্ক সেনানী। সবুজ যোদ্ধারা কোনোকালেও হেলিয়ামের দরজা পেরিয়ে শহরে আসেনি—এখন তারা এসেছে বন্ধু ও মিত্র হিসাবে, লাল মানুষদের এই হল উল্লাসের কারণ।

একদল উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী এলেন আমাদের অভ্যর্থনা জানাতে।

তাঁরা সনির্বন্ধ অনুরোধ জানালেন টার্স টারকাস ও তার দলনায়কদের নিয়ে আমি যেন পদব্রজে হেলিয়াম রাষ্ট্রনায়কের কাছে হাজির হই—তিনি আমাদের কাজের জন্য বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চান।

রাজপ্রাসাদের প্রকাণ্ড সিঁড়িগুলো ধাপে ধাপে উঠে গেছে প্রধান তোরণদ্বারের সামনে। সেখানেই সদলবলে দাঁড়িয়ে আছেন হেলিয়ামের নেতৃবৃন্দ। কাছে আসতে ওঁদের একজন নিজেই নেমে এলেন সিঁড়ি দিয়ে। সত্যিকারের সুপুরুষ বলতে যা বোঝায়—দীর্ঘ ঋজু চেহারা, শরীরের প্রত্যেকটি পেশী সুসমন্বিত। আর দৃপ্ত নায়কোচিত ভঙ্গি। আমায় আর কাউকে বলতে হল না যে ইনিই হেলিয়ামের জেডাক, তার্দোস মর্স—মঙ্গলের লাল মানুষদের শ্রেষ্ঠ পুরুষ।

তার পাশে এবার যিনি এসে দাঁড়ালেন—ইনিও কান্তিমান পুরুষ—এঁকেও আমার চিনতে কষ্ট হল না। নিশ্চয় মর্স কাজাক, লাল জাতির দ্বিতীয় শক্তিমান নেতা। আমার দিকে তাকিয়ে হাসছিলেন।

টার্স টারকাসের দিকে এগিয়ে এসে জেডাক তার্দোস বললেন—বারসুমের শ্রেষ্ঠ যোদ্ধার কাঁধে আমার বন্ধুত্বের হাত রাখতে পেরে আমি আজ নিজেকে ধন্য মনে করছি।

টার্স টারকাসও সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলে—হেলিয়াম-পতি! আজ আমরা সবুজ প্রাণীরা যে বন্ধুত্বের অর্থ বুঝতে পেরেছি তার জন্য দায়ী আরেক জগতের এক মানুষ। তাঁর কাছে আমরা এই বন্ধুত্বের জন্য ঋণী।

তার্দোস মর্স এবার আমার দিকে এগিয়ে এসে আমার কাঁধে হাত রাখলেন—আমাদের দ্বার আজ তোমার মতো সুসন্তানের জন্য মুক্ত। তোমার কীর্তিতে মুগ্ধ হয়ে আজ তোমারই হাতে সমর্পণ করলাম আমাদের শ্রেষ্ঠ দুর্মূল্য রত্ন—রাজকুমারী দেজা থোরিসকে। আমাদের সকলেরই এতে পরম সন্তোষ।

আরো অনেক বড়-বড় প্রশংসার কথা হল, তারপর একেক করে সমস্ত অভিজাত অমাত্যের সঙ্গে আমাকে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হল। দেজা থোরিসের বাবা মর্স কাজাকের সামনে দাঁড়ালাম অবশেষে। উনি আবেগে এমন আপ্লুত হয়েছেন যে একটি কথাও বলতে পারলেন না, শুধু হাতটি চেপে রাখলেন আমার কাঁধের ওপর।

চব্বিশ

॥ শান্তি থেকে শমন ॥

দশ দিন ধরে একটানা আমোদ-প্রমোদ হল থার্কবাসীদের নিয়ে। সবুজ যোদ্ধাদের আর তাদের বুনো উপজাতিদের প্রচুর ভোজ খাইয়ে আপ্যায়ন করে, দামি-দামি উপহার দিয়ে, অবশেষে মর্স কাজাকের নেতৃত্বে দশ হাজার হেলিয়াম সৈন্য তাদের সঙ্গে করে ফিরিয়ে নিয়ে গেল আপন রাজ্যে। হেলিয়ামের উপনেতা হিসাবে মর্স কাজাক কিছু অভিজাত অমাত্যকে সঙ্গে নিয়ে থার্ক অবধি পুরো রাস্তাটাই গেলেন তাদের সঙ্গে মিত্রতা ও শান্তির বন্ধনকে আরো শক্ত করে তুলতে।

টার্স টারকাসের সঙ্গে তার কন্যা সোলাও দেশে ফিরে গেছে। টারকাস তার নায়ক-উপনায়কদের সামনে প্রকাশ্যভাবে সোলাকে নিজের কন্যা বলে ঘোষণা করে দিয়েছে।

তিন সপ্তাহ বাদে একটা বড়ো উড়োজাহাজ পাঠানো হল থার্কে। মর্স কাজাক, টার্স টারকাস আর সোলা সেই বিমানে চেপে ফিরে এলো হেলিয়ামে। উদ্দেশ্য অবশ্য দেজা থোরিস আর জন কার্টারের বিয়েতে সময় মতো হাজির থাকা।

দীর্ঘ নয় বছর আমি হেলিয়ামের সেবা করছি, কখনো তার পরিষদ সদস্য, অগণিত যুদ্ধে হেলিয়ামের সেনাপতি, তার্দোস মর্স বংশের রাজকুমার হিসাবে। আমার ওপর হেলিয়ামের মানুষদের সম্মান বর্ষণের যেন ক্ষান্তি নেই! এমন একটি দিনও যায় না যেদিন আমার অতুলনীয়া দেজা থোরিসের প্রতি তাদের প্রীতির কোনো নতুন নিদর্শন আসে না রাজপ্রাসাদে।

আমাদের প্রাসাদের ছাদে সোনার স্ফুটনাগারে রয়েছে একটি তুষারশুভ্র ডিম। গত পাঁচ বছর ধরে তাকে পালা করে অনবরত পাহারা দিচ্ছে দশ জন জেডাকের খাস রক্ষী। আমি আর দেজা প্রায় প্রতিদিনই সেখানে দাঁড়িয়ে ভবিষ্যতের নানা কল্পনা করি আর সেদিনটির অপেক্ষা

করি যেদিন ডিমের ভঙ্গুর খোলাটি ভেঙে যাবে।

কাল রাতেও এমনি বসে আমরা নানা কথাই ভাবছিলাম। কোথা থেকে কী অদ্ভুতভাবে আমাদের দুজনের দেখা হল, তারপর কী এক মনোরম ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করছে যখন আমাদের ঘরে এক নতুন অতিথি আসবে। হঠাৎ একটা উড়োজাহাজের অতি উজ্জ্বল সাদা আলো—প্রথমে এমন একটা অতিসাধারণ দৃশ্যে আমরা কোনো মনোযোগই দিইনি। কিন্তু বিদ্যুতের বেগে জাহাজটা ছুটে আসতে লাগল আমাদেরই প্রাসাদের দিকে। ব্যাপারটা এবার একটু অস্বাভাবিক ঠেকল। বিমানটা থেকে কেবলই সংকেত আসতে লাগল, স্বয়ং জেডাকের জন্য খুব জরুরি খবর আছে। অধৈর্যভাবে চক্কোর কাটতে লাগল, প্রাসাদের ছাদে বিশেষ বিমান-অবতরণের ক্ষেত্রে নামবার অনুমতির অপেক্ষায়।

দশ মিনিটের মধ্যে বিমানটি প্রাসাদের ছাদে নেমে আসার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আমার কাছে ডাক এল এখুনি পরামর্শকক্ষে যেতে হবে। সেখানে গিয়ে দেখি প্রায় সব সদস্যই এর মধ্যে উপস্থিত হয়েছে।

সিংহাসন-মঞ্চের ওপর উদ্বিগ্নভাবে পায়চারি করছেন তার্দোস মর্স। সবাই আসন গ্রহণ করলে তিনি আমাদের দিকে ফিরে তাকালেন।

—আজ সকালে বারসুমের বিভিন্ন দেশের সরকারের কাছে খবর এসেছে, বাতাবরণ কারখানার পরিচালক দুদিন ধরে কোনো বেতার ঘোষণা করছে না। অন্য সব দেশের রাজদূতেরা আমাদের ধরেছে ব্যাপারটা হাতে নেবার জন্য। অবিলম্বে সহকারী পরিচালককে কারখানায় নিয়ে যেতে বলছে তারা। এইমাত্র একটা বিমান ফিরে এসেছে পরিচালকের মৃতদেহ নিয়ে। তার মৃতদেহ একটা গর্তের মধ্যে পড়েছিল, তারই বাড়ির নিচে। কোনো অজ্ঞাত আততায়ীর হাতে ভীষণভাবে খুন হয়েছে, লাশটা পর্যন্ত ছিন্নভিন্ন।...বারসুমের পক্ষে এ ঘটনার তাৎপর্য বুঝিয়ে বলার কিছু নেই। কারখানার ওই শক্তিশালী দেয়াল ফুঁড়ে ভেতরে ঢুকতে কয়েক মাস সময় লেগে যাবে—আমরা সে কাজ করতে শুরুও করেছি...কিন্তু এর মধ্যে সবচেয়ে ভয়ংকর যা ঘটবার তাই ঘটেছে। পরীক্ষায় জানা গেছে বারসুমের প্রতিটি প্রান্তে হাওয়ার চাপ

দ্রুত কমে যাচ্ছে—তার মানে কারখানার ইঞ্জিন বন্ধ।···

এইটুকু বলার পর তিনি শেষ কথাগুলো বললেন—বন্ধুগণ। আমরা আর বড়ো জোর মাত্র তিনটি দিন বাঁচব!···

বেশ ক'মিনিট একেবারে নিস্তব্ধ নির্বাক হয়ে রইল সবাই। তারপর একজন যুবক সদস্য উঠে খাপ থেকে তলোয়ার খুলে মাথার ওপর উঁচু করে ধরল। তার্দোস মর্সকে উদ্দেশ করে বলল—হেলিয়ামের মানুষদের চিরকালের গর্ব যে তারা জানে কীভাবে বাঁচতে হয়। আজ আমাদের সুযোগ এসেছে প্রমাণ দেবার যে আমরা মরতেও জানি। চলুন আমরা এমনভাবে নিজেদের কর্তব্য কাজ করে চলি যাতে মনে হয় আরো হাজার বছর বেঁচে থাকব মানুষের মতো।

পরিষদ কক্ষে হর্ষধ্বনি তুলে আমরা মুখে হাসি নিয়ে যে-যার মতো চলে গেলাম বাইরে, কিন্তু মনের ভেতরটা ভীষণ উদ্বেগে গুমরোতে লাগল। যখন নিজের প্রাসাদ-ঘরে ফিরে এলাম, বুঝতে পারলাম দেজা থোরিস এর মধ্যেই কনাঘুষোয় খবর পেয়ে গেছে। আমি তাকে প্রকৃত অবস্থাটা বুঝিয়ে বললাম।

পরের দু'দিন হাওয়ার মধ্যে কিছু কম-বেশ অনুভব করিনি। কিন্তু তৃতীয় দিনের সকালে নিঃশ্বাস নিতে বিলক্ষণ কষ্ট হতে লাগল। বিশেষ করে উঁচু ছাদের ওপর। হেলিয়ামের রাস্তাঘাটে মানুষের ভিড় জমে গেছে। সমস্ত কাজকর্ম বন্ধ। নিশ্চিত দুর্ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটানো যাবে না, তাই অনেকেই সাহস করে মাথা উঁচু করে আছে। কিন্তু তবু মাঝে-মধ্যে এখানে-ওখানে দেখতে পেলাম নরনারী কান্নায় ভেঙে পড়ছে।

দুপুর নাগাদ অনেক দুর্বল রোগা মানুষ সোজা হয়ে দাঁড়াতে না পেরে অর্ধচেতন হয়ে পড়ে গেল। আরো ঘণ্টাখানেক বাদে বারসুমের মানুষেরা দম আটকে-মরার আগে যেমন হয় তেমনি ধীরে অচৈতন্য অবস্থার মধ্যে নিঃঝুম হয়ে যেতে লাগল। দেজা থোরিস, আমি এবং রাজপরিবারের আরো সবাই প্রাসাদের অন্দরমহলের নিচু আঙিনায় এসে জড়ো হয়েছি। কথা বললেও খুব নিচু গলায় কথাবার্তা হচ্ছে।

মৃত্যুর করাল ছায়া ধীরে ডানা মেলছে আমাদের ওপর। এমনকি উলাও যেন আসন্ন বিনাশের আঁচ পেয়ে দেজা আর আমার কোল ঘেঁষে মাথা গুঁজে করুণভাবে আওয়াজ করছে।

ছাদ থেকে ছোট স্ফুটন যন্ত্রটি নিচে আনা হয়েছে দেজার ইচ্ছায়। ও বসে বসে কেবলি চেয়ে রয়েছে সেই ক্ষুদ্র জীবন-কোরকটির দিকে যা আর কোনোদিনও ফুটবে না ওর চোখের সামনে।

নিঃশ্বাস নেওয়া বেশ কঠিন হয়ে উঠেছে এখন। তার্দোস মর্স উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—আর কী, এবার আমরা পরস্পরের কাছ থেকে চিরবিদায় নিই। বারসুমের গৌরবের দিনগুলোর অবসান হল। কালও সূর্য উঠবে এক মৃত গ্রহ-জগতের ওপর, এ গ্রহ তবুও চিরকাল ঘুরবে নিজের কক্ষে, কিন্তু কোনো স্মৃতিচিহ্ন অবধি থাকবে না তার। এই তাহলে শেষ !

এক-এক করে প্রত্যেকের কাঁধে হাত রাখলেন তিনি। চোখ ফেরাতে আমার নজর পড়ল দেজা থোরিসের ওপর। ওর চেহারার পরিবর্তন দেখে অবাক হয়ে গেলাম। মাথা ঝুঁকে পড়েছে, শরীরে যেন প্রাণ নেই। একটা অস্ফুট আওয়াজ করে ওকে বুকে জড়িয়ে ধরলাম। চোখ মেলে তাকাল আমার চোখের দিকে।

হঠাৎ একটা প্রচণ্ড রাগ যেন ছেয়ে গেল আমার শরীরের মধ্যে। এত সব বিপদ-আপদের ভেতর দিয়ে কাটিয়ে এলাম সে কি এইভাবে শেষ হয়ে যাবার জন্য ? আমার পূর্ব-পুরুষদের রক্ত যেন শরীরের মধ্যে টগবগিয়ে বিদ্রোহ করে উঠল। মুহূর্তের এই প্রবল উত্তেজনায় যেন কোনো প্রেরণা এসে গেল মনে, স্মৃতির একটা দরজা সহসা খুলে গেল—কিছু একটা মনে রাখা উচিত ছিল, অথচ ভুলেই গিয়েছিলাম।

বহুদিন আগেকার জানা সেই ন'টি শব্দতরঙ্গের চাবি-কাঠি—আরে, আমার কাছেই তো আছে সেই গোপন রহস্য ! আবহাওয়া কারখানার তিনটে বড় দরজা খুলে ফেলবার কৌশল !

তার্দোস মর্সের দিকে ফিরে বললাম—জেডাক, একটা বিমান চাই এক্ষুনি। এখনো বোধহয় আমি বারসুমকে বাঁচাতে পারি !

সঙ্গে-সঙ্গে আদেশ গেল। তীরগতির একটা স্কাউট-বিমান উড়ে এল প্রাসাদের ছাদে। দেজা থোরিসের কপালে হাত রেখে, উলাকে পাহারা দেবার জন্য হুকুম দিয়ে ছুটে চললাম ছাদের দিকে। বুকে যতটা দম রাখতে পারি। একটু বাদেই আমার বিমান ছুটল সারা বারসুমের শেষ ভরসাস্থল লক্ষ্য করে। নিশ্বাস নেবার জন্য বাধ্য হয়ে বিমানকে নিচুতে রেখে চালাচ্ছি। পুরনো শুকনো সমুদ্রতলের ওপর দিয়ে সোজা চালাবার ফলে জমি থেকে কয়েক ফুট উঁচুতেই রাখলে চলবে।

গতিবেগ চরমে রেখে চলছি কারণ সময় আর মৃত্যুর বিরুদ্ধে এখন আমাকে পাঞ্জা লড়তে হচ্ছে। অন্ধকার ঘনিয়ে আসার মুখে হঠাৎ দেখলাম আবহাওয়া কারখানার প্রাচীরগুলো দূর থেকে দেখা যাচ্ছে। নেমে এলাম মাটির ওপর। ওই তো সামনে সেই ছোট দরজা যার ওপারে এই গোটা গ্রহটির সমস্ত জীবের প্রাণবায়ু আটকে পড়ে আছে।

দরজার পাশে একদল মানুষ আপ্রাণ খেটে একটা পথ করবার চেষ্টা করছে দেয়াল কেটে। কিন্তু দেয়ালের সামান্য একটু চিলতে ওঠানো ছাড়া এতক্ষণে তারা কিছুই করতে পারেনি। তার ওপর অর্ধেক কর্মীই তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে শুয়ে আছে, এখন হাওয়া পেলেও জাগবে কিনা কে জানে। এখানকার অবস্থা তো দেখছি হেলিয়ামের চেয়েও খারাপ।

অতি কষ্টে দম নিয়ে একজন সুস্থ কর্মীকে প্রশ্ন করলাম—আমি যদি এই দরজাগুলো খুলতে পারি, তো তোমাদের মধ্যে কেউ আছে যে বাতাবরণের ইঞ্জিন চালু করতে পারে?

লোকটি বললে—আমি পারি, যদি তাড়াতাড়ি খুলে দিতে পারেন। এখনো একটু দম আমার রয়েছে··কিন্তু তাতে কী লাভ হবে? চালকদের দু'জনই তো মারা গেছে···বারসুমে আর কেউ তো ও তালা-খোলার গোপন রহস্য জানে না।

তখন আর বাক্যব্যয় করার সময় নেই। প্রতি মুহূর্তে ভয়ানক দুর্বল হয়ে পড়ছি। মনের ওপর অতি কষ্টে সংযম রেখেছি। কোনো রকমে শেষ চেষ্টার মতো হাঁটু গেড়ে বসে সামনের দরজার দিকে প্রয়োগ

করলাম ন'টি শব্দের চিন্তা-তরঙ্গ। মঙ্গলের কর্মী আমার পাশে হামাগুড়ি দিয়ে বসেছে। আমরা ছুজনেই নির্নিমেষ নেত্রে চেয়ে আছি দরজাটার দিকে মৃত্যু-নীরব প্রতীক্ষায়।

ধীরে ধীরে ভারি কবাটখানা পেছিয়ে যেতে লাগল। আমি একবার চেষ্টা করলাম উঠে দাঁড়িয়ে ওটার সঙ্গে-সঙ্গে ভেতরে এগিয়ে যাই। কিন্তু তখন আমি এত ছুর্বল যে পারলাম না।

সঙ্গীকে বুললাম—যাও, ওটার পেছন-পেছন ভেতরে চলে যাও! যদি পাম্প ঘরে পৌঁছতে পার তো সব পাম্পগুলোই চালু করে দিও। বারসুমকে যদি বাঁচতে হয় এই হবে শেষ সুযোগ।

যেখানে শুয়ে ছিলাম সেখান থেকেই খুলে দিলাম দ্বিতীয় দরজাটাও। তারপর তৃতীয়। বারসুমের শেষ আশার চিহ্নটুকু দেখতে হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকলাম শেষ প্রবেশপথটার ভেতরে। তারপর জ্ঞানহারা হয়ে পড়ে গেলাম মাটির ওপর।

পঁচিশ

॥ আবার আরিজোনার গুহায় ॥

যখন জন কার্টার আবার চোখ মেলে চাইল তখন চারদিক অন্ধকার। ওর শরীরে শক্ত কট্‌কটে অদ্ভুত পোশাক। ও উঠে বসতে পোশাকের কাপড় ফেটে ঝুর-ঝুর করে গুঁড়ো হয়ে পড়ে যেতে লাগল।

মাথা থেকে পা অবধি ছুঁয়ে ছুয়ে দেখল সে, আগাপাস্তলাই তো পোশাক। অথচ সে যখন বাতাবরণ কারখানার দরজার সামনে অজ্ঞান হয়ে শুয়ে পড়েছিল তখন তো পোশাক প্রায় ছিলই না ওর দেহে! ওর সামনে জোৎস্নাভরা আকাশের একটা ফালি দেখা যাচ্ছে ভাঙা-চোরা পাহাড়ি ফোকরের ফাঁক দিয়ে।

ওর হাতটা এসে জামার পাশের পকেটে ঠেকল; পকেটের ভেতরে পাতলা কাগজে মোড়া এক বাণ্ডিল দেশলাই। একটা দেশলাই বের করে ঘষতেই জ্বলন্ত কাঠির আলোয় দেখতে পেল মস্ত একটি গুহার মধ্যে বসে আছে ও।

গুহার পেছনদিকে একটা অদ্ভুত স্থির মূর্তি হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে ছোট একখানা বেঞ্চের ওপর। কাছে গিয়ে দেখলে একটা বুড়ির মৃতদেহ, কতকাল থেকে শুকনো হয়ে কুঁকড়ে পড়ে আছে শুধু দেহের অবশেষটুকু। মাথায় লম্বা সাদা চুল। যেটার ওপর হুমড়ি খেয়ে আছে সেটা একটা কাঠকয়লার চুল্লি। চুল্লির ওপর একটা গোল তামার পাত্র, কিছু সবুজ ধরনের চূর্ণ পদার্থ তাতে।

বুড়ির পেছনে গুহার ছাদ থেকে কাঁচা চামড়ার ফিতে দিয়ে টাঙানো এক সার নরকঙ্কাল। একটা ফিতে আবার বেরিয়ে এসেছে বুড়ির শুকনো মরা হাত অবধি। জন সেই ফিতে ধরে টানতে সব কঙ্কাল এক সঙ্গে দুলে উঠল খর্‌খর আওয়াজ করে, শুকনো পাতার মতো।

বিশ্রি বীভৎস দৃশ্য দেখে জন কার্টার ছুটে বেরিয়ে এল বাইরের খোলা হাওয়ায়। গুহার সামনে ছোট পাথরের কিনারাটার ওপর এসে দাঁড়াতে জনের চোখে যে-দৃশ্য জেগে উঠল তাতে ওর ভিরমি খাবার

অবস্থা। এক নতুন আকাশ, নতুন প্রকৃতি-চিত্র ওর সামনে। দূরে রুপোলি পাহাড়ের রেখা। মাথার ওপর প্রায় স্থির হয়ে থাকা একটা চাঁদ, নিচের ক্যাকটাস্-ছড়ানো ও উপত্যকা তো মঙ্গলের নয়। জন প্রথমে নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিল না, এখন ধীরে ধীরে বাস্তব সত্যটুকু বুঝতে পেরে গেল—তার সামনে আরিজোনার সেই জায়গা—দশ বছর আগে ও একই জায়গা থেকে নির্নিমেষ নয়নে তাকিয়ে রয়েছিল মঙ্গলগ্রহের দিকে।

দু'হাতে মাথাটা চেপে ধরে ও গুহামুখের পথ ধরে নিচে নেমে গেল ভগ্নোদ্যম একটি মানুষের মতো। পাঁচ কোটি মাইল দূর থেকে মঙ্গলের লাল চোখ তাকিয়ে রয়েছে ওর দিকে, তার অদ্ভুত গোপন রহস্য নিয়ে।

মঙ্গলবাসী সেই মানুষটি পাম্প-ঘরে যেতে পেরেছিল কি? প্রাণদায়ী বায়ু কি শেষ অবধি যথাসময়ে মঙ্গলবাসীদের কাছে পৌঁছেছিল ওই দূরান্ত গ্রহে? ওর দেজা থোরিস কি বেঁচে গিয়েছিল, নাকি তার সুন্দর দেহও মৃত্যুর শীতল ছোঁয়া লেগে পড়ে রইল ছোট সোনার স্ফুটনযন্ত্রটার পাশে, তার্দোস মর্সের প্রাসাদের আঙিনায়?

দশ বছর ধরে জন কার্টার এসব প্রশ্নের জবাব খুঁজে বেড়াল—প্রতীক্ষায় রইল একটা উত্তরের জন্য। দশ বছর ধরে ও কেবলই প্রার্থনা করেছে তাকে যেন সেই হারানো ভালবাসার জগতে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। দেজা থোরিসকে ছেড়ে লক্ষ-লক্ষ ভয়ংকর যোজন দূরে এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকার চেয়ে বরং ওর পক্ষে বেশি কাম্য দেজার পাশে মৃত্যুশয়নে থাকা।

জন কার্টার তার পুরনো সেই সোনার খনিটা আবার খুঁজে পেয়েছে—যেমন ছিল তেমনি, কেউ স্পর্শও করেনি। আর তার ফলে সে আজ কোটিপতি ধনী। কিন্তু ধনের ওপর কোনো আগ্রহ তার নেই।

আজ রাতে হাডসন নদীর ধারে তার ছোট পাঠঘরটিতে বসে জন কার্টার বাইরে তাকিয়ে আছে। কুড়ি বছর পেরিয়ে গেছে সেদিনটির পর যেদিন ও চোখ মেলে চেয়েছিল মঙ্গলগ্রহের আকাশের নিচে।

ডেস্কের পাশে জানলা দিয়ে দেখতে পাচ্ছে আকাশের সেই উজ্জ্বল

মঙ্গল, আজো সে যেন আবার তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। মনে হচ্ছে জন কার্টার যেন মহাকাশের অগাধ শূন্যতা পেরিয়ে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে—এক প্রাসাদের বাগিচা, সেখানে মেঘবরণ চুল এক সুন্দরী রাজকুমারী, একটি ছোট শিশু বালক তাকে হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে আছে, আর রাজকুমারী পৃথিবীর দিকে আঙুল দেখিয়ে তাকে কিছু বলছে। ওদের পায়ের কাছে এক প্রকাণ্ড প্রাণী, কুশ্রী কিন্তু সোনার মতো খাঁটি তার হৃদয়।

জন কার্টারের বিশ্বাস ওরা আজও তার প্রতীক্ষায় রয়েছে। মনের গভীরে তাকে কেউ যেন বলে—আবার সে ওদের দেখা পাবে, সেই ক্ষণটুকু আসতে বেশি দেরি নেই।

জন কার্টার কি আবার ফিরে পেয়েছিল রাজকন্যা দেজা থোরিসকে? ও কি মঙ্গলের প্রাণীদের নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে পেরেছিল? জানতে হলে জন কার্টারের আগামী অভিযানের কাহিনী পড়তে হবে —'মঙ্গলের অপদেবতা'।